সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 30 | No. 3 | 1987

Check for updates

মাইকেলের মাদ্রাস-জীবন : কিংবদন্তী এবং বাস্তব

Volume	30
Issue	3
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	গোলাম মুরশিদ
Published online	June 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v30i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i3.1
Pages	1-36
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মাইকেলের মাদ্রাস-জীবন : কিংবদন্তী এবং বাস্তব

গোলাম মুরশিদ

শর্ম্মিষ্ঠা (১৮৫৯) নাটক প্রকাশের সময় থেকে আরম্ভ করে বীরাঙ্গনা (১৮৬২) প্রকাশের সময় পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক তিন বছরের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি এবং নাট্যকার হিশেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অবশ্য রাতারাতি প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও, কোনো রোমাঞ্চ-কাহিনীর লেখকের মতো তিনি শস্তা জনপ্রিয়তা পাননি। তবে একশো তিরিশ বছর পরেও, নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে তাঁকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক এবং অন্যতম প্রধান শিল্পী বলে স্বীকার করতে হয়।

স্বভাবকবিত্বে তাঁর বিশ্বাস ছিলো না। নিরন্তর কঠোর পরিশীলন এবং ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই তিনি কবি হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন দেশবিদেশের ভাষা-সাহিত্য থেকে, বহু বছরের পরিশ্রমের মাধ্যমে। মাদ্রাস থেকে বন্ধু গৌরদাস বসাককে তিনি যে-চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে, তিনি প্রতিদিন প্রায় বারো ঘণ্টা ধরে হিব্রু, গ্রীক, তেলেগু, সংস্কৃত, ল্যাটিন এবং ইংরেজি শিখছিলেন। চিঠিতে তিনি প্রশ্ন করেছেন, পিতৃ-পুরুষের ভাষাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার জন্যে তিনি কি যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন না?[১] সন্দেহ নেই, তাঁর মতো এতো ব্যাপক এবং বিচিত্র মূলধন নিয়ে বাংলা সাহিত্যের কোনো শিল্পী যাত্রা শুরু করেননি। এই মূলধনের একটা বড়ো অংশই তিনি আহরণ করেছিলেন, যখন তিনি মাদ্রাসে ছিলেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁর জীবনের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কথা এ যাবৎ সামান্যই জানা ছিলো। বস্তুত, যা জানা ছিলো, তার বেশির ভাগই ছিলো কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, এমন কি, গুজব। তথ্যের অপ্রতুলতাই এই কিংবদন্তীর উৎস নয়, মাইকেল নিজেও জেনে এবং

না-জেনে এই কিংবদন্তী রচনায় সহায়তা করেছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কাউকে কিছু বলা তিনি পছন্দ করতেন না।[২] তা সত্ত্বেও মাদ্রাসে তাঁর সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বন্ধুদের দু-একটা খবর দিয়েছেন। অংশত এসব তথ্য এবং অংশত জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করেই যোগীন্দ্রনাথ বসু মাইকেল-সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ১৮৯৩ সালে। তবে এ গ্রন্থে জীবনীর উপাদান সামান্যই ছিলো। মাদ্রাসজীবনের বাড়তি কিছু তথ্য উদ্ধার করেন নগেন্দ্রনাথ সোম। তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যপর্ব নিয়ে মোটামুটি প্রামাণ্য জীবনী লিখলেও, মাদ্রাস-জীবন সম্পর্কে নতুন কিছু সংযোজন করতে পারেননি। বিশেষ সফল না-হলেও, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মাদ্রাসজীবন সম্পর্কে নতুন তথ্য জোগাড় করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মাদ্রাসজীবন নিয়ে সবচেয়ে বেশী তথ্য সংগ্রহ করেন সুরেশচন্দ্র মৈত্র। তিনি সেকালে মাদ্রাসে প্রকাশিত কিছু পত্রপত্রিকা, কয়েকটি পঞ্জিকা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র খুঁজে পান। তবে ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ অথবা সুরেশচন্দ্র মৈত্র চার্চের পুরোনো কাগজপত্র খুঁজে পাননি। এমন কি, মনে হয়, কোথায় কোথায় প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কেও তাঁদের স্পষ্ট ধারণা ছিলো না। সেজন্যেই বিবাহরহস্যসহ বহু ঘটনাই এখনো অজানা রয়ে গেছে। অথচ এসব তথ্য উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা যে আত্যন্তিক, তা বলাই বাহুল্য।

এ পর্যন্ত মাইকেলের মাদ্রাসজীবনের বিষয়ে যা লেখা হয়েছে, সংক্ষেপে তা হলো : পিতা রাজনারায়ণ টাকাপয়সা দিতে অস্বীকার করায় মাইকেল একদিন হঠাৎ কাউকে কিছু না-জানিয়ে মাদ্রাসযাত্রা করেন। তিনি মাদ্রাসে পৌঁছেন ১৮৪৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর। সেখানে যাবার অল্প পরেই তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হন।[৩] সেরে ওঠার পর তিনি মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামে অধস্তন শিক্ষকের চাকরি পান। অচিরেই নীলকর কন্যা রেবেকা ম্যাকট্যাভিশের সঙ্গে তাঁর প্রণয়সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে *Madras Circulator* পত্রিকায় তাঁর চারটি প্রেমের কবিতা প্রকাশিত হয়। তারপর এ বছরেরই কোনো একটা সময়ে রেবেকার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, রেবেকার আত্মীয়স্বজনের বিরোধিতা সত্ত্বেও। ১৮৪৯ সালের এপ্রিল-মে মাসে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *Captive*

Lodii প্রকাশিত হয়। এরপর মাদ্রাসে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয় কবি এবং ভালো শিক্ষক হিসেবে। ১৮৫২ সালের জানুআরি মাসে তিনি মাদ্রাস হাই স্কুলের (তখনকার নাম মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয়) টিউটর নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ সালে মাইকেল তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জানুআরি মাসের শেষে ক লকাতা যাত্রা করেন।

ওদিকে পারিবারিক জীবনে ১৮৫৫ সালের ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি রেবেকার সঙ্গে সুখী জীবন যাপন করেছেন, চারটি সন্তানসহ। কিন্তু মি. হোল্ট নামে কলকাতা যাত্রার আগেই রেবেকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়, আর বিয়ে হয় ফরাসি মেয়ে হেনরিএটার সঙ্গে। হেনরিএটা কিছুকাল পরে কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন। অতঃপর তাঁরা সুখী বিবাহিত জীবন যাপন করতে থাকেন।

এ যাবৎ প্রচলিত এই বিবরণে কেবল যে অনেকগুলো ফাঁকই রয়ে গেছে, তাই নয়, এর মধ্যে কোনো কোনো তথ্য সঠিকও নয়। ১৪০ বছর আগে মাইকেল যখন মাদ্রাস যান, তখনকার কাগজপত্র এখন বেশির ভাগই হারিয়ে গেছে। সুতরাং তাঁর মাদ্রাসপ্রবাসের পূর্ণাঙ্গচিত্র রচনা করা অসম্ভব। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে সে জীবনের এ যাবৎ অজানা কিছু তথ্য উদ্ধারের প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে। বিশেষ করে তাঁর দুই বিবাহ নিয়ে যে-রহস্য গড়ে উঠেছিলো, তার প্রায় সবটাই মোচন করার চেষ্টা করেছি।

এক

মাইকেল মাদ্রাসবাসী কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে মাদ্রাসযাত্রা করেন বলে যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং নগেন্দ্রনাথ সোম দাবী করেছেন।[৪] নগেন্দ্রনাথ বসুসহ বেশির ভাগ জীবনী লেখকই মনে করেন যে, তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন ১৮৪৮ সালের প্রথম দিকে।[৫] কিন্তু সুরেশচন্দ্র মৈত্র লিখেছেন যে, মাইকেল মাদ্রাস পেঁীছেন ১৮৪৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর।[৬] এই তথ্য তিনি কোথায় পেয়েছেন জানিনে। আসলে মাইকেল কলকাতা ত্যাগ করেন বার্ক লেডী সেইল জাহাজে ক'রে, ২৯ ডিসেম্বর তারিখে। সম্ভবত কম খরচের জন্যেই তিনি এই জাহাজটি বেছে নেন। সাধারণত তখন কলকাতা থেকে মাদ্রাস যেতে চার-পাঁচদিন সময় লাগতো।

কিন্তু এই জাহাজ গাঞ্জাম, কলিঙ্গপত্তম, ভিজাগাপত্তম এবং করিঙ্গা হয়ে মাদ্রাসে পৌঁছে ১৮ জানুআরি।[৬ক] এবং যাত্রীদের তালিকায় সুরেশ-চন্দ্র মৈত্রের প্রদত্ত তালিকার চারজন দক্ষিণী ছাত্রের কারো নাম দেখা যাচ্ছে না।[৭] বস্তুত, জাহাজে মধুসূদন এবং চারজন দেশীয় ভৃত্য (native servants) ছাড়া সবাই ছিলেন য়োরোপীয়। মধুসূদন দেশীয় হলেও তিনি যে য়োরোপীয়দের সহযাত্রী হবার যোগ্য, তা বোঝানোর জন্যেই বোধহয় তাঁর নামের শেষে লেখা আছে 'of Bishop's College'।

মধুসূদন মাদ্রাসে পৌঁছার আগে, ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কলকাতা থেকে যে যাত্রীরা মাদ্রাসে এসে পৌঁছেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন Dr. Duff & Mrs. Duff।[৮] অনুমান করি, ইনি আলকজান্ডার ডাফ। তা ছাড়া, ২৯ ডিসেম্বর তারিখে এসেছিলেন Rev. Sutton। সম্ভবত এঁদের মাধ্যমেই মধুসূদন মাদ্রাসের খৃস্টান সমাজে প্রাথমিক পরিচয় লাভ করেন। মাইকেল গৌরদাস বসাককে পরে চিঠিতে লিখেছিলেন যে, কলকাতা ত্যাগের আগে তিনি দারুণ বিরক্ত এবং উদ্‌বিগ্ন ছিলেন এবং মাদ্রাসে যাবার কথা মাত্র দু-তিন জনের কাছে বলেছিলেন।[৯] আমার ধারণা, এই দুতিন জনের মধ্যে একজন ছিলেন কলকাতার আর্চডিকন টমাস ডিয়াল্‌ট্রি। এঁরই কাছে তিনি ১৮৪৩ সালের ফেব্রুআরি মাসে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।[১০] মাইকেল কলকাতা ত্যাগের কিঞ্চিদধিক তিনমাস পরে ইনি মাদ্রাস হয়ে ইংল্যাণ্ড গমন করেন,[১১] এবং ইংল্যাণ্ড থেকে মাদ্রাসে ফিরে সেখানকার লর্ড বিশপ হন। ধারণা করি, এঁরই প্রভাবে তিনি মাদ্রাসের খৃস্টান সমাজে সহায়তা লাভ করেছিলেন। নয়তো সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় গিয়ে অত দ্রুত অরফ্যান অ্যাসাইলামে চাকরি পাওয়ার কথা নয়।

মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামের অদূরেই ছিলো ফিমেল অরফ্যান অ্যাসাইলাম। এবং এখানকার মেয়েরা মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামের স্কুলে লেখাপড়া শিখতেন ছেলেদের সঙ্গে। রেবেকা ম্যাকট্যাভিশ ছিলেন ফিমেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামের বাসিন্দা। তিনি লেখাপড়া শেখেন সম্ভবত মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামের স্কুলে। এবং এই স্কুলের সদ্য নিযুক্ত তরুণ সহকারী শিক্ষক মাইকেলের প্রতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি আকৃষ্ট হন।

১৮৪৮ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে বসবাসকারী বহু ইংরেজই স্থানীয় মহিলাদের বিবাহ করেছিলেন। এর প্রমাণ আছে সেকালের চার্চ রেজিস্টার এবং সিভিল ম্যারেজ রেজিস্টারে। কিন্তু তখন পর্যন্ত কোনো ইংরেজ মহিলা কোনো কৃষ্ণাঙ্গকে বিয়ে করেছিলেন এমন কোনো প্রমাণ খুঁজে পাইনি। W. H. B. Morens সরাসরি দাবী করেছেন যে, দেশীয়দের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তই সবার আগে শ্বেতাঙ্গ নারীর পাণি গ্রহণ করেন।[১২] কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গিনীদের বিবাহরীতি প্রচলিত না-থাকায়, মাইকেলের সঙ্গে রেবেকার বিবাহে রেবেকার হিতাকাঙ্ক্ষীরা তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন,—মাইকেল নিজেই চিঠিতে এ সংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু এ বিরোধিতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিলো রেবেকার আগ্রহাতিশয্যে।[১৩] আমার ধারণা, কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন না-থাকায়, রেবেকার আগ্রহ এ ব্যাপারে জয়ী হয়। অ্যাসাইলামের অন্য একজন শিক্ষক রিচার্ড নেইলরও মধুসূদনকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন।[১৪] পরবর্তীতে মাইকেল *Captive Ladie* পত্রিকায় প্রকাশ করার সময়ে তা এঁরই নামে উৎসর্গ করেন। তা ছাড়া, পরের বছর প্রথম বিবাহ-বার্ষিকীর চারদিন আগে তিনি আরো দুটি সনেট উৎসর্গ করে নেইলা-রের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বিয়ের সময়ে সাক্ষী হিসেবেও ছিলেন জে. আর. নেইলর এবং এস. এইচ. নেইলর।

রেবেকার পরিচয় নিয়ে এ পর্যন্ত কার্যত কিছুই জানা যায়নি। মধুসূদন নিজেও যথেষ্ট জানতেন বলে মনে হয় না। তিনি গৌরদাসকে লিখে-ছিলেন, Her father was an indigo-planter of this presidency · · ·"[১৫] এই সূত্র ধরে প্রথমে নগেন্দ্রনাথ সোম এবং তারপরে ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ[১৬] থেকে আরম্ভ করে সুরেশচন্দ্র মৈত্র[১৭] সবাই লিখেছেন যে, রেবেকার পিতা ছিলেন নীলকর। কারণ মধুসূদন লিখেছিলেন 'was an indigo-planter'। তা হলে ডুগালড ম্যাকট্যাভিশ কে? সুতরাং এঁরা বলেছেন, তিনি ছিলেন রেবেকার পিতমহ। সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্প্রতি চার্চের খাতা থেকে খবর পেয়েছেন যে, বিয়ের সময়ে রেবেকার পিতার নাম লেখা হয়েছিলো ডুগালড ম্যাকট্যাভিশ। সুতরাং তিনি ভুল সংশোধন করে বলেছেন যে, ডুগালড রেবেকার পিতামহ নন, পিতা ছিলেন।[১৮] কিন্তু তিনি আর একটু তলিয়ে দেখলেই লক্ষ্য করতেন যে, রেবেকার পুরো নাম রেবেকা টম্পসন ম্যাকট্যাভিশ। আসলে রেবেকা ১২ বছর বয়সে

পিতাকে হারান। তারপর থেকে তাঁর ধর্মপিতা ডুগাল্ড ম্যাকট্যাভিশের নামও যুক্ত হয় তাঁর নামের শেষে।

বিয়ের সময়ে রেবেকার বয়স হয়েছিলো ১৭ বছর।[১৯] ১৮৪৮ থেকে ১৭ বছর বাদ দিয়ে ১৮৩১ সালের চার্চ রেজিস্টার থেকেই রেবেকার পিতামাতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ বছরের ২১ ডিসেম্বর তারিখে তাঁর ব্যাপটিজমের সময়ে পিতার নাম লেখা হয় রবার্ট টম্পসন, হর্স আর্টিলারি ব্রিগেডের গানার। আর মায়ের নাম ক্যাথরিন টম্পসন। মায়ের পরিচয় ইণ্ডো-ব্রিটন।[২০] এ থেকে দেখা যাচ্ছে, মধুসূদন 'of English parentage' বলে স্ত্রীকে নিয়ে গর্ব করলেও, আসলে তিনি পুরোপুরি য়োরোপীয়ান ছিলেন না। রেবেকার জন্ম হয় নাগপুরে, ১৮৩১ সালে।

রেবেকার পিতা রবার্ট টম্পসনের সঙ্গে মা ক্যাথরিন ডাইসনের বিয়ে হয়েছিলো বাঙ্গালোরে, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮২৫ তারিখে। মাইকেল এবং রেবেকার মতো তাঁদেরও বিয়ে হয়েছিলো ব্যানস দিয়ে।[২১] রেবেকা ছাড়া তাঁদের সারাহ নামে আর একটি কন্যা জন্মে ১৮৩৬ সালের ৯ জানুআরি তারিখে। এরও জন্ম হয়েছিলো নাগপুরে।[২২] রবার্ট টম্পসন মারা যান ১২ এপ্রিল ১৮৪৪ সালে।[২৩] এবং এই সুবাদেই রেবেকা আশ্রয় পেয়েছিলেন ফিমেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামে। অতঃপর তাঁর ভগ্নী সারাহ এবং মাতা ক্যাথরিন কোথায় যান, তার কোনো সন্ধান চার্চ রেজিস্টার থেকে জোগাড় করতে পারিনি। অনুমান করি, তাঁর মাতা অন্য কাউকে বিয়ে করেন। এবং সে জন্যেই নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে রেবেকার বক্তব্যই সবচেয়ে গুরুত্ব লাভ করেছিলো ।

কখন রেবেকার সঙ্গে মধুসূদনের বিয়ে হয় এ নিয়ে এ যাবৎ যথেষ্ট সংশয় ছিলো। সুরেশচন্দ্র মৈত্র ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ১৮৪৮ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে *Madras circulator* পত্রিকায় যখন মাইকেলের চারটি প্রেমের কবিতা প্রকাশিত হয়, তখন রেবেকার সঙ্গে তাঁর প্রণয়লীলা চলছে।[২৪] তার মানে বিয়ে হয় তার পরে। অন্য জীবনী লেখকরাও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সম্ভবত ১৮৪৮ সালের শেষদিকে এ বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ে হয়েছিলো ৩১ জুলাই তারিখে, মাদ্রাসের চার্চে।[২৫]

বিয়ের সময়ে চার্চের রেজিস্টারে মাইকেলের পিতৃপরিচয় বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লেখা হয়েছে—Narain Dutt, Advocate, Supreme Court, Calcutta।[২৬]

বিয়ের পর একাধিক কারণেই মাইকেল বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে মাদ্রাসে বাস করতে থাকেন। সকল হিতাকাঙ্ক্ষীর বিরোধিতার মুখে শ্বেতাঙ্গিনী রেবেকাকে বিয়ে করতে পেরে তিনি নিশ্চয়ই একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পেরেছিলেন। হয়তো শ্বেতাঙ্গিনীর স্বামী হিসেবে একটা সমাজিক প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছিলেন।

এই পরিতৃপ্ত অবস্থায় মাইকেল একদিকে 'ইউরেশিয়ান' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন; অন্যদিকে কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ের উল্লেখ করেই তিনি লিখেছিলেন যে, পিতৃপুরুষের ভাষাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে তিনি বিবিধ ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করছেন।[২৭] ১৮৪৯ সালের ডিসেম্বর এবং পরের বছর জানুআরি মাসে তিনি ইউরেশিয়ান পত্রিকায় *Rizia* নাট্যরচনা প্রকাশ করেন। তারপরে প্রকাশ করেন *Upsori* খণ্ডকাব্য। আমার ধারণা *Rizia* সম্পর্কে তিনি বেশ উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। সে জন্যেই ১৮৫০ সালে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি কবিতায় নিজের নাম অথবা Timothy Penpoem ছদ্মনাম না-লিখে 'By the author of *Rizia*' লেখেন। যা লক্ষণীয়, তা হ'লো, the author of *The Captive Ladie* লেখেননি, যদিও এ কাব্য ততোদিনে মাদ্রাসের বেশ কয়েকটি পত্রিকার পাতায় প্রশংসিত হয়েছে। *The Captive Ladie* কখন প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। ১৯ মার্চ তারিখে তিনি গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন যে, একাব্য প্রায় তৈরি।[২৮] তারপর এপ্রিল মাসের শেষ দিকে জানান যে, গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।[২৯] কিন্তু ঠিক কবে প্রকাশিত হয়, তা বলেননি। *Athenaeum* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্র থেকে এই তারিখ সম্পর্কে আর একটু ভালো ধারণা পাওয়া যায়। ১৭ এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় এই গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত সমালোচনা করে এই পত্র প্রকাশিত হয়। মধুসূদনকে পত্রলেখক তুলনা করেছেন ইংরেজি প্রখ্যাত রোম্যানটিক কবিদের সঙ্গে। পত্রলেখক আরো উল্লেখ করেন যে, মাইকেলের সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয় নেই।[৩০]

মাইকেল যখন এই কাব্য রচনা করেন, তখন সাংসারিক জীবনে তিনি রীতিমতো তৃপ্ত। রেবেকা গর্ভবতী। কাব্য প্রকাশের কয়েক মাস পরে, ভাবী সন্তানের চিন্তায় উচ্ছ্বসিত মাইকেল গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন, Do you know that I expect to be a father soon? Heigh ho! my stars are brightening,...'[৩১] মাইকেল এবং রেবেকার এই সন্তান—কন্যা—জন্মগ্রহণ করে ১৮ আগস্ট তারিখে। তাঁরা এর নাম দেন বার্থা ব্লেঞ্চ, তৃতীয় নাম সাহায্যকারী অরফ্যান অ্যাসাইলামের সম্পাদক চার্লস কেনেটের নাম অনুযায়ী কেনেট, আর শেষ নাম পিতার বংশনাম ডাট। ব্যাপটিজমের সময়ে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন J. R. Nailor অন্য একজন চার্লস কেনেট স্বয়ং।[৩২]

রেবেকা এবং মাইকেলের দ্বিতীয় সন্তানও একটি কন্যা। প্রথম কন্যা জন্মগ্রহণের পর রেবেকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হাওয়া বদলের জন্যে রেবেকা ১৮৫০ সালের কোনো একটা সময়ে উত্তরদিকে যাত্রা করেছিলেন।[৩৩] নিজের জন্মস্থান নাগপুরে কিনা, জানিনে। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও, রেবেকা গর্ভবতী হন। এবং তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করে ১৮৫১ সালের ৯ মার্চ তারিখে। এর পুরো নাম ফিবি রেবেকা সালফেল্ট ডাট।[৩৪] তৃতীয় নাম Saalfelt দিয়েছিলেন A. W. Saalfelt-এর নাম অনুযায়ী। আর প্রথম নামটি দিয়েছিলেন কেনেট পরিবারের সদস্য ফিবি কেনেটের নাম থেকে। ব্যাপটিজমের সময়ে ইনি চার্চে হাজির ছিলেন।[৩৫]

এরপর মাইকেল এবং রেবেকার দুটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জর্জ জন ম্যাকট্যাভিশ ডাটের জন্ম ১৮৫২ সালে।[৩৬] এর তৃতীয় নামটি রেবেকার ধর্মপিতা ডুগালড ম্যাকট্যাভিশের নাম থেকে নেওয়া। যাঁদের প্রতি রেবেকা বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন, তাঁদের নাম সন্তানদের নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। আর মাইকেল যাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন—নেইলর, তাঁর নামে উৎসর্গ করেছিলেন একাধিক কবিতা। জর্জ নর্টনকেও উৎসর্গ করেছিলেন ক্যাপটিভ লেডি। মাইকেল এবং রেবেকার কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম ১৮৫৫ সালের ৯ মার্চ তারিখে। এর নাম দেওয়া হয় মাইকেল জেমস ডাট।[৩৭]

দুই

মাইকেলের কর্মজীবন শুরু হয় ১৮৪৮ সালের ফেব্রুআরি অথবা মার্চ মাসে। কয়েক মাস পরে অন্তত একটি পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁর তখনকার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় *Madras Circulatee* পত্রিকায়। এই সূত্রেই মাদ্রাসের পত্রিকামহলে তাঁর পরিচিতি; এবং তিনি যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেন। বছরের শেষ দিকে তাঁর ক্যাপটিভ লেডি কাব্য প্রকাশিত হয় মাদ্রাস সার্কুলেটরের পাতায়। আগেই লক্ষ্য করেছি, গ্রন্থাকারে এই কাব্য প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৪৯ সালের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে।

ক্যাপটিভ লেডি প্রকাশিত হলে এই কাব্য মুদ্রণের খরচ বাবদ তিনি দেনায় জড়িয়ে পড়েন। সুতরাং আর্থিক কোনো লাভ তাঁর হয়নি কিন্তু মাদ্রাসে কবি হিশেবে এবং এক শ্বেতাঙ্গিনীর চোস্ত ইংরেজি-জানা শিক্ষিত স্বামী হিশেবে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাঁর এই খ্যাতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ঐ বছরের শেষ দিকে একটি পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইউরেশিয়ান নামে এই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন মধুসূদনের চেয়ে এক বছরের বড়ো অ্যাবেল পেন সিমকিনস। এই পত্রিকা প্রকাশিত হতো প্রতি শনিবার। ৩ নভেম্বর (১৮৪৯) তারিখে এর প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে।

মাদ্রাসে ইউরেশিয়ানদের সংখ্যা ছিলো যথেষ্ট। আমার ধারণা, তাঁদের প্রভাবও ছিলো যথেষ্ট। তা না হলে প্রধানত তাঁদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে ঐ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্ভবত প্রকাশিত হতো না। তবে অ্যাবেল পেন সিমকিনস নিজে বোধ হয় ইউরেশিয়ান ছিলেন না। তাঁর পিতা লেফটেন্যান্ট টমাস সিমকিনস ছিলেন রীতিমতো ইংরেজ। অবশ্য ১৮১৭ সালে তিনি যাঁকে বিয়ে করেন---সেই সফিয়া ম্যাকেনজি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিলেন কিনা, আমার জানা নেই।[৩৮]

ইউরেশিয়ান পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই মাইকেল *Rizia* নাটক প্রকাশ করতে থাকেন। মোট নটি দৃশ্য প্রকাশিত হয় জানুআরি মাস পর্যন্ত।[৩৯] এছাড়া, এ পত্রিকায় মাইকেলের আরো অনেকগুলো পুরোনো এবং নতুন কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো।

১৮৫০ সালে অ্যাবেল সিমকিনস *Madras Advertiser*[৪০] এবং *Eurasian* ছাড়া তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে তৃতীয় আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর নাম দেওয়া হয় *Madras Hindu Chronicle*। ঠিক হয় প্রতি বৃহস্পতিবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালের অকটোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে।[৪১] মাইকেল এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ওদিকে *Eurasian* পত্রিকাকে আর একটু ব্যাপক ভিত্তির ওপর স্থাপনের উদ্দেশ্যে এর নতুন নাম দেওয়া হয় *Eastern Guardian*। হিন্দু ক্রনিক্‌ল-এর সম্পাদক নিযুক্ত হবার পর *Eastern Guardian*-এর সঙ্গে তাঁর আর কোনো যোগাযোগ ছিলো কিনা, আমার জানা নেই।

Madras Hindu Chronicle খুব প্রতিশ্রুতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম সংখ্যায় যে-মৌলিক প্রবন্ধ এবং অন্যান্য পত্রিকা ও রচনা থেকে উদ্ধৃতি প্রকাশিত হয়, তা দেখে *Athenaeum* পত্রিকা খুব সন্তোষ প্রকাশ করে। এতে লেখা হয়, 'From the spirit of its original articles as well as of its extracts a favourable impression of the views and the intentions of the new paper will be formed...'[৪২] প্রথম সংখ্যাতেই মাইকেল যে-প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ ছিলো। তিনি যখন ১৮৫২ সালের মার্চ মাসে এই পত্রিকার সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন, তখনো *Athenaeum* পত্রিকা মাইকেল সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলো। এতে বলা হয়, *Daily News, Crescent* এবং *Examiner*-এর মতো মোটামুটি ভালো পত্রিকা থাকলেও, 'there is but one paper, the *Hindu Chronicle*, which has any pretensions to merit...'[৪৩] এতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, এই পত্রিকা যখন রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ব্যবসায়িক দিক দিয়ে লাভজনক হতে যাচ্ছে, ঠিক তখন সম্পাদকের পদত্যাগের ফলে বন্ধ হবার উপক্রম হলো।[৪৪] হিন্দু ক্রনিক্‌ল্-এ দেশীয় হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতো বলে *Athenaeum*-এ উল্লেখিত হয়েছে।[৪৫] এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে মাইকেল যে-খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, পরবর্তীতে তা তাঁকে বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে রক্ষা করেছিলো।

আমার ধারণা, শিক্ষক মাইকেলের চেয়ে সম্পাদক মাইকেলই বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন এবং সুনাম অর্জন করেছিলেন। হিন্দু ক্রনিক্‌ল্ ত্যাগের প্রাক্‌কালে *Athenaeum* লিখেছিলেন যে, একজন দেশীয় ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং খুব অনুকূল পরিবেশে কতোটা প্রতিভা এবং মননশীলতার পরিচয় দিতে পারেন, মাইকেল তাঁর উজ্জ্বলতম নিদর্শন। এতে আরো বলা হয় যে, মাইকেলের সহজাত ক্ষমতা হলো লেখকের, কিন্তু পরিবেশের চাপে পড়ে তিনি শিক্ষকতা নিতে বাধ্য হয়েছেন। মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী তাঁকে শিক্ষকতার পাশাপাশি পত্রিকার সম্পাদনা করতে না-দেওয়ায় পরিচালক-মণ্ডলীর সমালোচনা করা হয়। বলা হয় যে, শিক্ষকতার জন্যে স্কুলের সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকাই যথেষ্ট, তার বাইরে সম্পাদনার কাজ চলতে পারে।[৪৬] কিন্তু *Athenaeum*-এর এই সুপারিশ এবং সমালোচনা সত্ত্বেও মাইকেল পত্রিকা ত্যাগ করে পুরোপুরি মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চবিদ্যালয় অংশে যোগদান করেন।

মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চাকরি পাওয়ার আশ্বাস মাইকেল কয়েক বছর আগেই, বোধ হয় ১৮৪৯ সালের গোড়াতেই পেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট এবং অ্যাডভোকেট-জেনরেলের কাছ থেকে। এঁকেই মাইকেল 'ক্যাপটিভ লেডি' উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু চাকরির সুযোগ হয় ১৮৫২ সালের ৩১ জানুআরি তারিখে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক এইচ. বাওয়ার্স অবসর নেওয়ায়।[৪৭] মার্চ মাসে পরিচালকমণ্ডলী বাৎসরিক প্রতিবেদনে জানান যে, তাঁরা সর্বসম্মতি-ক্রমে কলকাতার একজন নেটিভ, মি. ডাটকে মি. বাওয়ার্সের জায়গায় মনোনীত করেছেন। মাইকেলের পরিচয় দিয়ে এঁরা বলেন, ইনি হিন্দু কলেজ এবং পরে বিশপস কলেজে লেখাপড়া শিখেছেন। ধ্রুপদী এবং ইংরেজি সাহিত্যে এঁর পাণ্ডিত্য খুবই উচুঁমানের, এবং বয়সে তরুণ হলেও শিক্ষকতায় তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।[৪৮] মার্চ মাসের কোনো একটা সময়ে তিনি এই পদে যোগদান করেন। *Athenaeum*-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে যে-ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তা থেকে মনে হয়, তিনি পরিবেশের চাপে পড়েই এই চাকরি নিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় টিউটরের পদে দেড়শো টাকা বেতনে নিযুক্ত হলেও,[৪৯] তিনি বোধহয় উচ্চতর পদে নিযুক্ত হবার আশ্বাস লাভ করেন। কিন্তু বাওয়ার্স পরের

বছরই বিলেত থেকে ফিরে এসে পুনরায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেন। এবারে তাঁকে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক পদে বহাল করা হয়। সম্ভবত এ-জন্যেই মাইকেল আর কখনো এ-পদে আসীন হতে পারেননি।

দ্বিতীয় টিউটরের পদে তিনি অন্তত তিন বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর ঠিক কখন তিনি এই পদ ছেড়ে দিয়ে *Spectator* পত্রিকায় যোগদান করেন এবং তার পদত্যাগের কারণ কী, এ নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। সুরেশচন্দ্র মৈত্র মনে করেন, মাদ্রাস উচ্চ-বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হলে মধুসূদন তাঁর চাকরি হারান।[৫০] কিন্তু সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক হিশেবে তিনি কয়েক বছর আগে যে-সুনাম অর্জন করেছিলেন, তারই জোরে তিনি *Madras Spectator* পত্রিকায় সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন।[৫১] অবশ্য পদের নাম সহ-সম্পাদক হলেও, কার্যত তিনিই সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতেন। পরের বছর কলকাতা যাত্রা করার আগে পর্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমার ধারণা, এ চাকরিতে তিনি শিক্ষকতার মতোই কমবেশি একই রকম বেতন পেতেন। ২০ ডিসেম্বর তারিখে তিনি গৌরদাস বসাককে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকে মনে হয়, ইংরেজ স্ত্রী আর চারটি সন্তান নিয়ে এ-সময়ে তিনি সুখেই ছিলেন।

তিন

মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে মাইকেল কদিনের জন্যে কলকাতায় এসে-ছিলেন ১৮৫১ সালের প্রথমার্ধের কোনো এক সময়ে। তারপর পরবর্তী সাড়ে চার বছরের মধ্যে তিনি কলকাতার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেননি। ইতিমধ্যে ১৮৫৫ সালের ১৬ জানুআরি তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। দীর্ঘদিন মধুসূদনের সঙ্গে যোগাযোগ না-থাকায়, গৌরদাস বসাক তাঁর ঠিকানা জানতেন না। এজন্যে তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ এবং সম্পত্তি নিয়ে কলহের কথা লিখে জানান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে। কৃষ্ণমোহন নাইল জাহাজে এক কন্যাসহ কলকাতা থেকে যাত্রা করেন ৭ ডিসেম্বর এবং নানা বন্দর হয়ে মাদ্রাসে পৌঁছেন ১৭ ডিসেম্বর।[৫২] ১৯ ডিসেম্বর তাঁর হাতে গৌরদাস বসাকের চিঠি পেয়ে তাঁর মনে খানিকটা উদাসীনতা দেখা দেয়। (I feel distracted)।

কিন্তু পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধারের জন্যে বন্ধুর কথামতো কলকাতা যাবেন কিনা, সে-সম্পর্কে মনঃস্থির করতে পারেননি। তখন কলকাতায় যেতে ক্যাবিনযাত্রীদের প্রায় দেড়শো টাকা ভাড়া লাগতো। সুতরাং সম্পত্তির পরিমাণ না-জেনে এতোটা ব্যয় করা ঠিক হবে কিনা, বুঝে উঠতে পারছিলেন না।[৫৩] শেষ পর্যন্ত পরের মাসে লেখা গৌরদাস বসাকের চিঠি পেয়ে সকল দ্বিধা কাটিয়ে তিনি কলকাতা যাত্রা করেন ২৮ জানুআরি।

কলকাতায় পৌঁছে তিনি ২ ফেব্রুআরি তারিখে গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন যে, তিনি সেদিনই সকালে বেন্টিঙ্ক জাহাজে করে কলকাতায় পৌঁছেছেন। আর জাহাজে 'তারা' তাঁর নাম দিয়েছিলো মিস্টার হোল্ট।[৫৪] এ চিঠি দেখেই মাইকেলের জীবনীকারেরা এ যাবৎ লিখেছেন যে, তিনি জাহাজে মি. হোল্ট নামে ভ্রমণ করেছিলেন এবং জাহাজটি কলকাতায় পৌঁছেছিলো দোসরা ফেব্রুআরি।[৫৫] কিন্তু তিনি কবে মাদ্রাস ত্যাগ করেন, এ-সম্পর্কে জীবনীকারেরা কিছু বলতে পারেননি। জাহাজে ভ্রমণের সময়ে তিনি কেন মি. হোল্ট নাম নিয়েছিলেন, জীবনীকারেরা তার এক-একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের মতে, তিনি রেবেকা এবং তাঁর হিতাকাঙক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে গোপনে মাদ্রাস ত্যাগ করতে চান, সে-জন্যেই মি. হোল্ট ছদ্মনাম গ্রহণ।[৫৬] সুরেশচন্দ্র মৈত্র এই মত সমর্থন করেছেন। তবে সেই সঙ্গে আর-একটা সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, তখন দেশীয়দের যেতে হতো ডেকে।[৫৭] কিন্তু মাইকেল ক্যাবিনে যেতে চান এবং সে-জন্যেই ইংরেজি নাম গ্রহণ করেন।[৫৮] অমলেন্দু বসুর ব্যাখ্যা ভিন্ন ধরনের। তিনি বলেছেন যে, হয়তো আগে থেকে আসন সংরক্ষণের সময় মাইকেলের হয়নি, সুতরাং মি. হোল্টের নামে সংরক্ষিত আসনে তিনি ভ্রমণ করেন।[৫৯]

কিন্তু সত্যিকার ঘটনা হলো মাইকেল ২৮ জানুআরি তারিখে মাদ্রাস ত্যাগ করেন বেন্টিঙ্ক জাহাজে। এ-জাহাজটি সাউথাম্পটন থেকে কলকাতা যাচ্ছিলো। শূন্য আসনে মাদ্রাস থেকে ছ'জন "ভদ্রলোক" যাত্রী, একজন নেটিব যাত্রী, দুজন দেশীয় ভৃত্য এবং দুজন সহিস ওঠেন। ভদ্রলোক যাত্রীদের মধ্যে একজনের নাম মাইকেল। পরের দিন *Athenaeum* পত্রিকায় যাত্রীদের তালিকায় একটি নাম দেখতে পাচ্ছি Mr. M. S. Dutt.[৬০]

তাহলে মাইকেল যে-হোল্ট নামের কথা লেখেন, সেটির ভিত্তি কোথায়? জাহাজটি ইংল্যান্ড থেকে কলকাতা যাচ্ছিলো এবং যাত্রীরা ছিলেন প্রায়ই সবাই য়োরোপীয়। তার মধ্যে মাইকেলের মতো বিদগ্ধ এবং চোস্ত ইংরেজি-বলা যাত্রী সহজেই হয়তো অন্য যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সম্ভবত ঠাট্টা করেই তাঁরা ডাটের সঙ্গে ধ্বনি সামঞ্জস্য রেখে হোল্ট নাম দিয়েছিলেন। তবে অন্য কোনো তথ্য না-পেলে এ-সম্পর্কে সত্যিকার ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। সরকারী কাগজ-পত্র অনুযায়ী জাহাজটি কলকাতায় পৌঁছে পয়লা ফেব্রুআরি।[৬১] যাত্রীদের তালিকায় মাদ্রাস থেকে আগত যাত্রীদের নামের মধ্যে পাচ্ছি মি. হোল্ট-সহ ছ'জনের নাম, আর মি. এম. এস. ডাটের নাম সেখানে অনুপস্থিত।[৬২] বোঝা যায়, কলকাতায় নামের তালিকা দেবার সময়ে জাহাজ-কর্তৃপক্ষ তাঁর নতুন নামই লিখে দিয়েছে, সত্যিকার নাম নয়।

চার

মাদ্রাস থেকে তিনি যাত্রা করেছিলেন এম. এস. ডাট নামে, কিন্তু কলকাতায় নামার সময়ে তাঁর নতুন নাম হলো মি. হোল্ট। অন্যদিকে পারিবারিক জীবনে মাদ্রাস থেকে তিনি যাত্রা করেছিলেন রেবেকার স্বামী হিসেবে; কিন্তু কলকাতায় পরবর্তীতে পরিচিত হন হেনরিএটার স্বামী বলে। জাহাজে নাটকীয়ভাবে নাম বদলের যদিবা কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবও হয়, পারিবারিক জীবনে রাতারাতি এতো বড়ো পরিবর্তন কী করে হলো, তা বোঝা যায় না।

মাইকেল ২০ ডিসেম্বর গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন, 'I have a fine English wife and four children.' তখন তার মধ্যে কোনো ব্যঙ্গ বা বক্রোক্তি ছিলো না।[৬৩] এমন কি, অদূর ভবিষ্যতে এই পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে যাবার কোনো আশঙ্কা থাকলেও, এ-রকমের উক্তি করা অসম্ভব,---যদিনা কেউ চরম ভণ্ড হন। কিন্তু মাইকেলের চরিত্রে ভণ্ডামি ছিলো না। তাঁর চিঠিপত্রে তিনি বহুজন সম্পর্কেই বহু রূঢ় মন্তব্য করেছিলেন। অথচ মাদ্রাস ত্যাগের পর তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে আদৌ কোনো সম্পর্ক রাখেননি। আগেই লক্ষ্য করেছি, তার কনিষ্ঠ পুত্র মাইকেল জেমস ডাট জন্মেছিলো তিনি মাদ্রাস ত্যাগ করার মাত্র

দশ মাস আগে,—৯ মার্চ ১৮৫৫ তারিখে। তখনো তার ব্যাপটিজম হয়নি। তার ব্যাপটিজম হয় মাইকেল মাদ্রাস ত্যাগ করার কিঞ্চিদধিক দু মাস পরে, দোসরা এপ্রিল।[৬৩ক] এবং এর মৃত্যু হয় আরো উনিশ দিন পরে, এপ্রিল মাসেরই ২১ তারিখে।[৬৪] তা সত্ত্বেও, তিনি মাদ্রাস যাননি। বস্তুত, স্নেহের বন্ধন অথবা পারিবারিক দায়িত্ব কোনো কিছুই মাইকেলকে তাঁর স্ত্রী আর সন্তানদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে কোনটা বিবেচনা এবং কোনটা অবিবেচনা, বলা শক্ত। কারণ আন্তরিক প্রণয় থেকেও মানুষ মানুষকে আঘাত করতে পারে। সুতরাং কেবল রেবেকাকে ত্যাগ করলে তার হয়তো একটা ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু চার-চারটি অপগণ্ড অসহায় সন্তানকে তিনি কোন বিবেচনায় ফেলে এসেছিলেন, তা বোঝা মুশকিল। মাইকেল এঁদের জন্যে এক গাদা টাকাকড়িও রেখে আসেননি। কারণ ২০ ডিসেম্বরের চিঠিতেই বলেছেন, তিনি হলেন 'a poor devil' এবং কলকাতায় যাওয়া খুব খরচ সাপেক্ষ, যেতে চান যদি পিতার সম্পত্তি থেকে সেই খরচ পোষানো যায়। সুতরাং বলা যায়, স্ত্রী এবং সন্তানদের মাদ্রাসে ফেলে এসে তিনি বীররসের কোনো বড়ো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেননি।

২০ ডিসেম্বর থেকে ২৮ জানুআরির মধ্যে রেবেকার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে হেনরিএটাকে বিয়ে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না, করেনওনি। অন্যদিকে, মাদ্রাসে হেনরিএটার সঙ্গে তাঁর আদৌ কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, কলকাতায় এসে তিনি চিঠির মাধ্যমে তাঁকে আহবান জানান, এবং হেনরিএটা অমনি কলকাতায় চলে আসেন, ---এটাও যুক্তিসঙ্গত নয়। আমার ধারণা, মাইকেলের সঙ্গে অরফ্যান অ্যাসাইলামের ছাত্রী রেবেকার প্রণয়-সম্পর্ক যখন গড়ে ওঠে, তখন থেকেই তিনি ঐ একই বিদ্যালয়ের ছাত্রী হেনরিএটাকে চিনতেন। তার-পর ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে মাইকেলের গোপন প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রেবেকার সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপনের পাশাপাশি মাইকেল হেনরিএটার সঙ্গে দ্বৈত জীবন যাপন করছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, এমনিভাবেই জীবন চলতে থাকবে। সে-জন্যেই ২০ ডিসেম্বরের চিঠিতে লিখেছিলেন, রেবেকা এবং শিশুদের নিয়ে তিনি ভালোই আছেন।

কিন্তু ২০ ডিসেম্বর থেকে ২৮ জানুআরির মধ্যে কোনো সময়ে অথবা মাদ্রাস ত্যাগের পর হেনরিএটার সঙ্গে তাঁর গোপন প্রণয় সম্পর্কের কথা রেবেকা জানতে পান। স্বজনদের ত্যাগ করে, সব বিরোধিতা উপেক্ষা করে, যাঁকে বিয়ে করেছিলেন, তাঁর বিশ্বস্ততার অভাব দেখে, রেবেকা হয়তো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। এ-জন্যেই রেবেকার কাছে মাইকেল দ্বিতীয়বার ফিরে যাননি অথবা ফিরে যেতে পারেননি। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, গোপন প্রণয়ের কথা একবার প্রকাশ পাওয়ার পর, মাইকেলের আর কোনো সংকোচ থাকেনি এবং বিরোধিতার মুখে তিনি হেনরিএটার দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন।

রেবেকা কিন্তু মাইকেলকে ত্যাগ করতে পারেননি। তিনি যখন মারা যান, তখনো তাঁর পরিচয় ছিলো মাইকেলের স্ত্রী হিশেবে। ১৮৯২ সালের ২২ জুলাই তারিখে তাঁকে সমাধিস্থ করার পর, চার্চের খাতায় তাঁর নাম লেখা হয় রেবেকা টম্পসন ডাট।[৬৪ক] সুরেশচন্দ্র মৈত্র লিখেছেন যে, রেবেকার সমাজে দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ লজ্জা বা কলঙ্কের বস্তু নয়, তা সত্ত্বেও তিনি মাইকেলকে ত্যাগ করেন নি।[৬৫] কিন্তু আমার বিশ্বাস, মাইকেলের প্রতি প্রণয় নয়, রেবেকার দ্বিতীয়বার বিবাহ করার বিষয়ে একমাত্র বাধা ছিলো তাঁর তিন-তিনটি কৃষ্ণাঙ্গ সন্তান। পরবর্তী আলোচনায় লক্ষ্য করবো, এই সন্তানদের জীবনও সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে পারেনি।

বিবাহ বিচ্ছেদ করে রেবেকার দ্বিতীয়বার বিয়ে না-করার অন্য একটি কারণ হতে পারে: হেনরিএটার সঙ্গে মাইকেলের প্রণয়সম্পর্কের কথা জানতে পেরে তিনি ইচ্ছে করেই বিবাহবিচ্ছেদে সম্মত হননি, যাতে মাইকেল হেনরিএটাকে কখনই আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করতে না-পারেন।

পাঁচ

রেবেকাকে নিয়ে সাড়ে সাত বছর ঘর করলেও, মাইকেলের যথার্থ স্ত্রী এবং দোসর হিশেবে সাধারণত হেনরিএটাকেই চিহ্নিত করা হয়। হেনরিএটা বাংলা শিখেছিলেন এবং মাইকেলের রচনার প্রথম পাঠিকা

ছিলেন,—কবি নিজেই একথা বলেছেন।[৬৬] হেনরিএটা তাঁর সঙ্গে সাগর-দাঁড়িতেও বেড়াতে গিয়েছিলেন।[৬৭] তাছাড়া, ছায়ার মতো জীবনের শেষ পর্যন্ত মাইকেলের সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু হেনরিএটার পরিচয় এ-যাবৎ বলতে গেলে কিছুই জানা যায়নি। জনশ্রুতি এই যে, তিনি ছিলেন মধুসূদনের জনৈক ফরাসি সহকর্মীর কন্যা।

কিন্তু যে-সাক্ষ্যপ্রমাণ আমি পেয়েছি, তা থেকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি আদৌ ফরাসি ছিলেন না। তাঁর সত্যিকার নামও হেনরিএটা নয়,—অন্তত ব্যাপটিজমের সময়ে তাঁকে হেনরিএটা নাম দেওয়া হয়নি। সর্বোপরি, মাইকেলের সঙ্গে তাঁর আদৌ বিয়ে হয়নি।

মাইকেলের সহকর্মীদের মধ্যে একজনের নাম ছিলো T. B. Peppin এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর অন্য একজন সহকর্মীর নাম A. Dique। Peppin এবং Dique এই দুটি নামই ফরাসি হতে পারে। কিন্তু হেনরিএটা এঁদের কারো সন্তান ছিলেন না। টমাস বেডফোর্ড পেপিন ছিলেন ইংরেজ এবং তিনি নিজেই বিয়ে করেন ১৮৪৩ সালে।[৬৮] তাঁর প্রথম কন্যা মার্গারেটের জন্ম হয় ১৮৪৮ সালে।[৬৯] অপর পক্ষে, A. Dique মাদ্রাস হাই স্কুলের কলেজিএট বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ হন ১৮৫৩ সালে। বিয়ে করেন আরো পরে। তাছাড়া, তিনি ফরাসিও ছিলেন না। মাদ্রাস হাই স্কুলের রেজিস্টারেই ডিকের পরিচয় দেওয়া আছে—ইস্ট ইণ্ডিয়ান বলে।[৭০] হেনরিএটা যে ফরাসি ছিলেন না, তার আরো প্রমাণ তাঁর নিজের নাম। হেনরি এটার ফরাসিরূপ অঁরিএৎ। অ্যামিলিয়ার ফরাসিরূপ এমিলি, আর সফিয়া বা সফাইয়ার (Sophia) ফরাসি রূপ হলো সোফি (Sophie)।

কিন্তু প্রশ্ন হলো হেনরিএটার সত্যিকার পরিচয় কী? এ পরিচয়ের সূত্র লুকিয়ে আছে তাঁর সঠিক নামের মধ্যে। তাঁকে সমাধিস্থ করার সময়ে চার্চের রেজিস্টার তাঁর নাম লেখা হয়নি। যে-কারণে মাইকেলকে সমাধিস্থ করার বিষয় নিয়ে বিতর্ক এবং মতানৈক্য হয়েছিলো, সেই একই কারণে হেনরিএটাকে নিয়েও সম্ভবত বিবাদ দেখা দিয়েছিলো। গোরস্থানের খাতায় তাঁর নাম লেখা হয়েছিলো Emelia Henrietta Sophia Dutt, বয়স ২৭।[৭১] এখানে এমিলিয়া বানান এবং বয়স উভয়ই আসলে ভুল লেখা হয়েছিলো।

য়োরোপ থেকে স্বদেশ ফেরার মাস খানেক আগে মধুসূদন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হলে তাঁর সম্পত্তি যেন তাঁর দুই সন্তান এবং স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এখানে স্ত্রীর নাম লিখেছিলেন Amelia Henrietta Sophia।[৭২] এ ছাড়া কলকাতার চার্চ রেজিস্টারে তাঁর জীবদ্দশায় দুবার তাঁর নাম লেখা হয়েছিলো,----তাঁর দুই সন্তানের ব্যাপটিজম উপলক্ষে।

হেনরিএটা এবং মাইকেলের প্রথম সন্তান হেনরিএটা অ্যালাইজা শর্মিষ্ঠা দত্তের জন্ম হয় ১৮৫৯ সলের ১৫ সেপ্টেম্বর।[৭৩] তাঁর ব্যাপটিজম হয়েছিলো পরের বছর দোসরা ফেব্রুআরি। তখন মায়ের নাম লেখা হয়েছিলো অ্যামিলিয়া হেনরিএটা সফিয়া।[৭৪] তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান ফ্রেডারিক মাইকেল মিল্টনের জন্ম হয় ১৮৬১ সালের ২৩ জুলাই। পরের বছর ১৯ জানুআরি তারিখে তাঁর ব্যাপটিজমের সময়ে মায়ের নাম লেখা হয়েছিলো শুধু মাত্র অ্যামিলিয়া সফিয়া।[৭৫] আমার নিশ্চিত ধারণা, এটিই তাঁর সত্যিকার নাম। মাদ্রাস থেকে পালিয়ে এসে বিয়ে না-করে অন্য আর-এক স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও, মাইকেলের সঙ্গে সংসার করার দুর্নাম এবং আত্মীয়স্বজনদের সম্ভাব্য পীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই হয়তো তিনি হেনরিএটা নাম নিয়েছিলেন। তা ছাড়া, সাধারণ ক্রিশ্চিয়ান নামগুলোর মধ্যে প্রথম নামটিই প্রাধান্য পায় এবং ডাক-নাম হিশেবে গণ্য হয়। সুতরাং অ্যামিলিয়া বাদ দিয়ে তিনি কেন হেনরিএটা নামে পরিচিত হলেন, তার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না।

মাদ্রাস চার্চ এলাকায় (তার মানে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত) ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত যতো শিশুর জন্ম হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটি নাম আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। এদের মধ্যে বহু অ্যামিলিয়া, বহু হেনরিএটা, বহু সফিয়া ছিলেন। কিন্তু অ্যামিলিয়া হেনরিএটা সফিয়া এই তিনটি নাম এভাবে বা অন্য কোনোভাবে সাজানো নেই। এমন কি, এক সঙ্গে দুটি নামও কারো নেই,—একটি ছাড়া। এই নামটি হলো অ্যামিলিয়া সফিয়া। কলকাতায় পুত্রের ব্যাপটিজমের সময়ে যে-নাম লেখা হয়েছিলো।

অ্যামিলিয়া সফিয়ার পিতার নাম জেমস প্রেমব্রক কুপলি। মাইকেলের শ্বশুর স্কুল-শিক্ষক ছিলেন বলে জনশ্রুতি প্রচলিত ছিলো। জেমস কুপলিও ছিলেন স্কুল-শিক্ষক। দীর্ঘদিন ভেপারি নিউ অ্যাকাডেমির শিক্ষক ছিলেন। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর, জেমস কুপলি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন বিধবা সফিয়া সিমকিনসকে, ১৮৩৩ সালে।[৭৬] এঁদের প্রথম সন্তান অ্যামিলিয়া সফিয়ার জন্ম হয় ১৮৩৪ সালের ২৮ নভেম্বর।[৭৭] পরের বছর জেমস কুপলি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে *Madras Courier* পত্রিকায় যোগদান করেন। তারপর ১৮৩৮ সালে ইউনিয়ন প্রেস নামে একটি ছাপাখানা কিনে নিজেই *Madras Examiner* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা যখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তেমন সময়ে, ১৮৪৪ সালের ২৬ জুন তারিখে তিনি মারা যান।[৭৮] সেই সূত্রেই কিনা জানিনে, অ্যামিলিয়া সফিয়া সম্ভবত অরফান অ্যাসাইলামের সঙ্গে যুক্ত হন।[৭৯] আমার বিশ্বাস, এই অ্যাসাইলামের ছাত্রী হিসেবেই মধুসূদন সম্ভবত হেনরিএটাকে জানার সুযোগ পান। কিন্তু তাঁদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ ঘটে অন্যত্র।

১৮৪৯ সালে অ্যাবেল সিমকিনস নামে এক তরুণ *Eurasian* নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেছিলেন এবং তারপরের বছর প্রকাশ করেছিলেন *Madras Hindu Chronicle*—আমরা আগেই তা লক্ষ্য করেছি। এই দুটি পত্রিকারই বলতে গেলে একমাত্র লেখক ছিলেন মাইকেল। অ্যাবেল সিমকিনসের মা সফিয়া সিমকিনস বিধবা হবার পর তাঁকে বিয়ে করেছিলেন জেমস কুপলি। এবং তাঁদের প্রথম সন্তানই অ্যামিলিয়া সফিয়া। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মাইকেল যে-দুটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তাদের মালিক অ্যাবেল সিমকিনসের সহোদরা ছিলেন অ্যামিলিয়া সফিয়া এবং সেই সূত্রেই মাইকেলের সঙ্গে অ্যামিলিয়ার ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৮৪৯ সালে মাইকেল যখন *Eurasian* পত্রিকায় যোগ দেন, তখন অ্যামিলিয়ার বয়স ঠিক ১৫ বছর, রেবেকার ১৮। অতঃপর আরো আড়াই বছর প্রথমে *Eurasian* এবং পরে *Madras Hindu Chronicle* পত্রিকার সঙ্গে মাইকেলের যোগাযোগ ছিলো। অনুমান করি সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অ্যামিলিয়ার সঙ্গে মাইকেলের পরিচয় প্রণয়ে পরিণত হয়। এবং পরে মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলে চাকরি নিলে পত্রিকার সঙ্গে মাইকেলের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়, কিন্তু অ্যামিলিয়ার সঙ্গে প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন হয়নি।

১৮৫৬ সালের ২৮ জানুআরি মাইকেল যখন মাদ্রাস ত্যাগ করেন তখন অ্যামিলিয়া ওরফে হেনরিএটার বয়স ২১ বছর দু মাস। তখনো পর্যন্ত তাঁর বিয়ে হয়নি। সেকালে ভারতবর্ষে বাসরত ইংরেজ অথবা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের বিয়ে হতো সাধারণত ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সের মধ্যে। অনুমান করি, পিতৃহীন অ্যামিলিয়ার বিয়ের ব্যাপারে কোনো ধরনের সংকট দেখা দেয়। হতে পারে, বিয়ে না-হবার জন্যেই অনূঢ়া অ্যামিলিয়ার সঙ্গে মাইকেলের প্রণয়সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অথবা এমনও হতে পারে যে, মাইকেলের সঙ্গে তাঁর প্রণয় সম্পর্কের জন্যেই হয়তো তিনি বিয়ে করেননি।

অ্যামিলিয়ার ছোটোবোন, হেস্টার অথবা হেলেন ম্যারি ক্রুপলি তাঁর চেয়ে চার বছরের ছোটো।[৮০] তাঁর বিয়ে হয় মাদ্রাসের স্মল কজ কোর্টের করণিক স্যামুয়েল রজিয়ারের সঙ্গে, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সালে।[৮১] তখন অ্যামিলিয়ার বয়স ২২ বছর ১০ মাস। হেস্টারের প্রথম সন্তান জেমস পেমব্রুক রজিয়ারের জন্ম হয় ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে।[৮২] তখনো এবং তার পরেও মাদ্রাসের চার্চ-রেজিস্টারে অ্যামিলিয়ার বিয়ের কোনো খবর নেই।

আগেই লক্ষ্য করেছি, সেকালে একজন শ্বেতাঙ্গিনীর পক্ষে দেশীয় একজন কৃষ্ণাঙ্গকে বিয়ে করা সহজ কাজ ছিলো না। তদুপরি, মাইকেল ছিলেন বিবাহিত। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে বিয়ে হওয়া আইনত এবং ধর্মত অসম্ভব। এ সত্ত্বেও অ্যামিলিয়া মাইকেলের সঙ্গে একত্রে বাস করার সিদ্ধান্ত নেন। এ থেকে তাঁদের প্রণয়ের গভীরতা এবং এ ব্যাপারে অ্যামিলিয়ার দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। আমার বিশ্বাস, আত্মীয়স্বজনদের অনুমতি ছাড়াই তিনি কলকাতা যাত্রা করেন। এক্ষেত্রে ছদ্মনাম গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। তবে আত্মীয়দের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিলো অথবা পরে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৮৬০ সালের মে মাসে মাইকেল এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, স্ত্রীর এক আত্মীয় ইংল্যাণ্ডে মারা গেছেন পাঁচ মাস আগে এবং সে জন্যে তাঁর পরিবারে শোক পালিত হচ্ছে।[৮৩]

এই আত্মীয় সম্ভবত অ্যামিলিয়া ওরফে হেনরিএটার জ্যেষ্ঠভ্রাতা (বৈমাত্রেয়) উইলিয়াম ক্রুপলি অথবা চার্লস ক্রুপলি। তাঁরা তাঁদের পিতার জীবদ্দশাতেই ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত প্রমাণ

দেওয়া অসম্ভব। চার্চ/রেজিস্টারে মৃত্যুর সময়ে পিতার নাম উল্লেখিত হয় না,—এটাই নিশ্চিত প্রমাণের পথে অন্তরায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য অ্যামিলিয়া কলকাতায় চলে আসার এবং হেলেন ওরফে হেস্টারের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর অ্যামিলিয়ার কনিষ্ঠ সহোদর জেমস কুপলি এবং তাঁদের মাতা উটাকামণ্ডে গিয়ে স্থায়ীভাবে থাকেন। মাইকেল ১৫ মে তারিখে লিখেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রীর এই আত্মীয় মারা গেছেন পাঁচ মাস আগে। পূর্বোক্ত উইলিয়াম এবং চার্লসের মৃত্যু হয় পূর্ববর্তী ডিসেম্বরে।[৮৪]

অ্যামিলিয়া সফিয়ার নাম যে হেনরিএটা তার নিশ্চিত প্রমাণ তাঁর সহোদর ভ্রাতা অ্যাবেল সিমকিনসের *Eurasian* এবং *Madras Hindu Chronicle* পত্রিকার সম্পাদক হিশেবে মাইকেলের চাকরি। সেই সঙ্গে উইলিয়াম এবং চার্লস কুপলির সঠিক পরিচয় উদ্ধার করা গেলে বাড়তি প্রমাণ পাওয়া সম্ভব।

ছয়

অ্যামিলিয়া কখন কলকাতায় আসেন, বলা শক্ত। তবে তাঁর প্রথম সন্তান শর্মিষ্ঠার জন্ম হয় ১৮৫৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। সুতরাং তিনি ১৮৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের আগেই কলকাতায় পৌঁছেন বলে মনে হয়। আমার ধারণা ১৮৫৮ সালেরই কোনো একটা সময়ে তিনি কলকাতায় আসেন।[৮৫] তবে ১৮৫৭-৫৮ সালের যাত্রীদের তালিকায় আমি হেনরিএটা অথবা অ্যামিলিয়ার নামের সন্ধান পাইনি। জাহাজের যাত্রী হিশেবে তিনি নিশ্চয়ই কোনো ছদ্ম নাম নিয়ে থাকবেন।

কলকাতায় মাইকেলের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করলেও, অ্যামিলিয়া ওরফে হেনরিএটার সঙ্গে মাইকেলের যে বিয়ে হয়নি, সমকালের কবির বন্ধুরাও এ সন্দেহ করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু এ সম্পর্কে ১৮৮৯ সালে গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন; 'The Madras secret, I believe, is that Modhu eloped with the lady with whom he lived as wife but this myself and my son knew before I corresponded with you about Modhu's life, you did not tell me anything about it.'[৮৬] তাঁর জীবনী লেখকরা কেউ কেউ

সন্দেহ পোষণ করেছিলেন যে, ১৮৫৫ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে কলকাতা ফেরার আগে পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক এক মাসের মধ্যে রেবেকার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করে হেনরিএটাকে বিবাহ করা শক্ত।[৮৭] কিন্তু হেনরিএটার সঙ্গে আদৌ বিয়ে হয়নি, একথা কোনো জীবনীলেখক বলেননি।

১৮৬৭ সালে ব্যারিস্টার হয়ে য়োরোপ থেকে ফেরার এক মাস আগে মাইকেল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর অবর্তমানে তাঁর সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হবেন হেনরিএটা অ্যালাইজা শর্মিষ্ঠা, ফ্রেডারিক মাইকেল এবং অ্যামিলিয়া হেনরিএটা সফিয়া। ক্ষেত্র গুপ্ত যথার্থই সন্দেহ করেছেন যে, তাঁর পুত্র-কন্যা এবং 'স্ত্রী' আইনসঙ্গতভাবে তাঁর পুত্র-কন্যা এবং স্ত্রী হলে, তাঁদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে চিঠি লেখার প্রয়োজন হবে কেন?[৮৮] বস্তুত সেকালের আইন অনুযায়ী এঁরা কেউই মাইকেলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার কথা নয়। এবং সে জন্যেই এঁদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে এই চিঠি লিখতে হয়েছিলো।

আমার বিশ্বাস মাইকেলের সঙ্গে হেনরিএটার সম্পর্ক বিষয়ে কলকাতার খৃস্টান সমাজে অনেকেই জানতেন। তিনি যখন ব্যারিস্টার হিশেবে কলকাতা হাই কোর্টে যোগদান করার অনুমতি চান, তখন একাধিক বিচারপতি তাঁর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ এবং আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন।[৮৯] মাইকেলের একজন জীবনীলেখক বলেছেন যে, মদ্যপ বলে মধুসূদনের অখ্যাতিই হয়তো এর কারণ। কিন্তু মদ্যপান যে-সমাজে চা অথবা কফি পানের মতোই স্বাভাবিক, সেই ইংরেজদের মধ্যে এ ব্যাপারে অখ্যাতি থাকার কথা নয়। অন্তত মাইকেল কখনো বাইরে মাতলামি করেছেন, একথা কেউ কোথাও লেখেননি। তা ছাড়া, হেনরিএটা এবং মাইকেলের মৃত্যুর সংবাদ চার্চের রেজিস্টারে লিখিত হয়নি, তাঁদের সমাধিস্থ করার বিষয় নিয়েও খৃস্টান সমাজের পক্ষ থেকে দারুণ বিরোধিতা এসেছিলো। এ থেকে আমার ধারণা যে, মাইকেল মাদ্রাসে নিজের এবং পুত্রকন্যা ফেলে এসে, কলকাতায় বিয়ে না-করে অন্য নারীর সঙ্গে একত্রে বাস করছিলেন,—এই তথ্য পূর্বোক্ত বিচারপতিদের কানেও উঠেছিলো।[৯০] নীলদর্পণের সঙ্গে মধুসূদনের যোগাযোগ হয়তো অন্য কারণ।

অমলেন্দু বসু সঙ্গত একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন: মাইকেল মাদ্রাসে শ্বেতাঙ্গিনী এক স্ত্রীকে ফেলে আসা সত্ত্বেও ইংরেজ সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি কেন?[৭১] কিন্তু আমার মনে হয়, কারো পারিবারিক জীবন নিয়ে নীরব থাকাই ইংরেজ চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বরং রেবেকা কেন পলাতক ও বিশ্বাসঘাতক স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর নিজের এবং সন্তানদের ভরণপোষণের অথবা অন্য নারীর সঙ্গে বসবাসের অভিযোগে আদালতের শরণাপন্ন হলেন না, সেটাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমার বিশ্বাস, রেবেকা সত্যি সত্যি মধুসূদনকে ভালোবাসতেন। সুতরাং তাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর আত্মসম্মান এবং ভালোবাসা উভয়ই এতো আহত হয়েছে যে, আদালতের মাধ্যমে টাকাপয়সার দাবী আদায় করতেও তিনি ঘৃণাবোধ করেছেন। তাছাড়া, তখন মহিলাদের অধিকারও অনেক কম ছিলো। হয়তো আইনত প্রতিকারের সম্ভাবনা ছিলো না।

কিন্তু রেবেকা অথবা তাঁর সন্তানরা কি মাইকেলের খবর রাখতেন? কলকাতা থেকে মাদ্রাস ফেরত যাত্রীদের তালিকায় চার্লস কেনেট এবং মিসেস কেনেটের নাম লক্ষ্য করেছি।[৭২] রাজনারায়ণ বসুও লিখেছেন যে, তিনি একদিন মাইকেলের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গিয়ে মাইকেলের মাদ্রাসবাসী এক ফিরিঙ্গি বন্ধুকে দেখতে পান।[৭৩] সুতরাং সরাসরি যোগাযোগ না-থাকলেও, রেবেকা এবং মাইকেল উভয় উভয়ের সংবাদ পেতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মাইকেল মাদ্রাসে যে-চারটি সন্তান রেখে এসেছিলেন, শ্বেতাঙ্গিনী মায়ের আশ্রয়ে থাকলেও, তাদের জীবন খুব একটা স্বচ্ছন্দ অথবা স্বাভাবিক হয়েছিলো বলে মনে হয় না। যদিও কিংবদন্তী রয়েছে যে, রেবেকার কিছু সম্পত্তি ছিলো, তবু আমার মনে হয়, সম্পত্তি ছিলো না, বা থাকলেও তা ছিলো নগণ্য। কারণ সম্পত্তি থাকলে মাইকেল কলকাতায় যাওয়ার ভাড়া নেই বলে কাতরতা দেখাতেন না। তবে রেবেকার পিতা রবার্ট টম্পসন সৈন্য বিভাগে কাজ করতেন এবং সেই সূত্রে রেবেকা সামান্য পেনসন পেতেন কিনা জানিনে।

মাইকেলের সন্তানরা অবশ্য পিতার কাছ থেকে কেবল দারিদ্র্যই উত্তরাধিকার সূত্রে পাননি, সেই সঙ্গে পেয়েছেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান

পরিচয় এবং বর্ণ। মাইকেলের প্রথম কন্যা বার্থা অথবা দ্বিতীয় কন্যা ফিবি লেখাপড়া কতোটা শিখতে পেরেছিলেন জানিনে। কিন্তু তাঁদের বিয়ে সহজে হয়নি। ১৮৮২ সালের একই দিনে---২৬ জুলাই তাঁদের যখন বিয়ে হয়, তখন বার্থার বয়স ৩২ বছর ১১ মাস; আর ফিবির বয়স ৩১ বছর ৪ মাস। সেকালে মেয়েদের বিয়ের পক্ষে এ বয়স এতোই বেশি ছিলো যে, রেজিস্ট্রেশন-ফর্মে বয়সের ঘরে তাঁদের সত্যিকার বয়সের উল্লেখ না-করে লেখা হয়েছিলো "full age"। কেবল যে বেশি বয়সে তাঁদের বিয়ে হয়, তাই নয়, যে পাত্ররা তাঁদের ভাগ্যে জুটেছিলেন, তাঁরাও ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ। দুজনেই ছিলেন সাধারণ সৈনিক। বার্থার স্বামী ফ্রান্সিস জন হিগিনস ছিলেন ল্যান্স কর্পোরাল।[৯৪] আর ফিবির স্বামী, বিপত্নীক স্যামুয়েল ওয়াল্টার এইরিস ছিলেন তাঁর মাতামহের মতো গোলন্দাজ বাহিনীর সৈনিক।[৯৫]

কিন্তু বার্থা আর ফিবির পিতৃপরিচয়ের ঘরে কী লেখা হয়েছিলো? সেখানে লেখা হয়েছিলো: মাইকেল ডাট। জীবিত কি মৃত তার উল্লেখ নেই। এই বিয়ের ৯ বছর এক মাস আগে মাইকেল মারা যান। সুতরাং পিতার পেশার কোনো উল্লেখ থাকার কথা নয়। কিন্তু কিমাশ্চর্যম! সেখানে লেখা হয়েছে: ব্যারিস্টার। বোঝা যায়, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দারিদ্র্য এবং বর্ণ নিয়ে গর্ব করতে না-পারলেও, খাস বিলেত থেকে আসা বরদের তাঁরা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁদের পিতা ছিলেন ব্যারিস্টার।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন-ফর্মে লেখা এই একটি মাত্র শব্দ থেকেই বোঝা যায়, মাইকেলের সংবাদ রেবেকা এবং সন্তানরা জানতেন। এমনকি, তাঁর কবিখ্যাতি এবং স্বল্পসংখ্যক দেশীয় ব্যারিস্টারদের একজন হিশেবে তাঁর পরিচিতি নিয়ে তাঁরা দূর থেকে গর্বও বোধ করতেন।

তবে ৩৯ বছর বয়সে মাইকেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র জর্জ যখন বিয়ে করেন, তখন পিতা ব্যারিস্টার ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে কিছু লেখা হয়নি। তাঁর নিজের পরিচয় দেওয়া আছে 'দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল'। আর তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথ বেস্টিয়নের পরিচয়: বিধবা, বয়স ২৭।[৯৬] মাইকেলের এই তিন সন্তানেরই বিয়ে হয়েছিলো ধর্মীয় রীতিতে নয়, রেজিস্ট্রি অফিসে। সম্ভবত রেবেকা ধর্মীয় রীতির বিবাহে আস্থা হারিয়েছিলেন

এবং লক্ষ্য করেছিলেন যে, আইনসম্মত উপায়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করলে পরবর্তীতে আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়া সহজ হতে পারে।

পরিচয় প্রসঙ্গে আর-একটা কথা বলা দরকার। অমলেন্দু বসু লিখেছেন যে, মধুসূদনের মাদ্রাসবাসী ছেলেমেয়েরা নিজেদের বংশনাম ডাট না-লিখে ইংরেজি বংশনামের অনুকরণে Dutton লিখতেন।[৯৭] এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ পূর্ববর্তী তিন সন্তানই বিয়ের সময়ে নিজেদের নাম Dutt লিখেছিলেন। এমন কি, ১৯০০ সালে জর্জের স্ত্রী এলিজাবেথ যখন মারা যান তখনো তাঁর নাম লেখা হয় ডাট।[৯৮] কেবল ১৯১৫ সালে জর্জ, নিজে যখন পক্ষাঘাতে মারা যান, তখন তাঁর নাম লেখা হয়েছিলো জর্জ ডাটন।[৯৯] কিন্তু সেটা তাঁর মৃত্যুর পরে। এবং তাঁর সম্ভবত কোনো সন্তানাদি ছিলো না।

সাত

হেনরিএটা যখন কলকাতায় এসে মাইকেলের সঙ্গে বাস করতে শুরু করেন, তখন এ আশঙ্কা দেখা দেয়নি যে, কোনো কালে তাঁদের বিয়ে হবে না। কিন্তু রেবেকার দৃঢ়পণ এ ব্যাপারে বিরাট অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। যথাসময়ে হেনরিএটা গর্ভবতী হয়েছেন। সুতরাং বিয়ে না-হলেও বাকী জীবন মাইকেলের স্ত্রী হিশেবেই অতিবাহিত করেছেন। তিনি যে রীতিমতো বাংলা শিখে বাঙালি কবির স্ত্রী এবং দোসর হতে চেষ্টা করেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তদুপরি, বছর দুয়েক ছাড়া, বাকি সময়ে মাইকেলের নিদারুণ আর্থিক সংকটের মধ্যে তিনি সংসার চালাতে চেষ্টা করেছেন। ধারণা করি, মধুসূদনের প্রেম তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। আনুষ্ঠানিক বিয়ে না-হওয়ায় এবং কৃষ্ণাঙ্গের "স্ত্রী" হিশেবে কলকাতার ইংরেজ অথবা বাঙালি কোনো সমাজের সঙ্গেই তিনি মেলামেশা করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। স্বামী এবং সন্তানদের ক্ষুদ্র সংসার নিয়েই তাঁর জীবন আবর্তিত হয়।

তিনি যখন কলকাতায় আসেন, মাইকেল তখন পুলিশ দপ্তরের অনুবাদক, বেতন ১৫০ টাকা। এই টাকা দিয়ে হয়তো কায়ক্লেশে তাঁর

সংসার চলতো। মাইকেল যখন ১৮৬২ সালের জুন মাসে কলকাতা থেকে ইংল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন স্থির হয় যে, মহাদেব চট্টোপাধ্যায় হেনরিএটাকে প্রতিমাসে দেড়শো টাকা দেবেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই মহাদেব ইংল্যাণ্ডে মাইকেলকে নিয়মিত টাকা পাঠানো প্রায় বন্ধ করেন, হেনরিএটাকেও। বাধ্য হয়ে পরের বছর মার্চ মাসের সম্ভবত ২৩ তারিখ হেনরিএটা দুই সন্তানকে নিয়ে বিলেত যাত্রা করেন। কিন্তু মাইকেল নিজেও অর্থকষ্টের মধ্যে ছিলেন। এজন্যেই কম খরচে থাকার উদ্দেশ্যে তাঁরা লনডন ত্যাগ করে ফ্রান্সের ভের্সাইতে বাস করতে আরম্ভ করেন। এখানে দেনার দায়ে মাইকেলের জেলে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয়।[১০০] একজন ভদ্রমহিলা এবং চার্চের দয়ায় তিনি সপরিবারে টিকে থাকেন। প্যারিসের একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকেও তিনি মাত্র দুশো টাকা ধার নেবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেন।[১০১] ডাক মাশুল সংগ্রহ করেন বন্ধকের দোকান থেকে।[১০২] এরই মধ্যে হেনরিএটার একটি কন্যা জন্মে ১৮৬৪ সালের ৩ আগস্ট তারিখে।[১০৩] সম্ভবত শোচনীয় দারিদ্র্যের জন্যেই সন্তানটি জন্মের পরেই মারা যায়। দীর্ঘদিন পরেও, হেনরিএটা অসুস্থতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।[১০৪] সীমাহীন অর্থকষ্টের মধ্যে মাইকেল ত্রাণবার্তা পাঠান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। মাইকেল তেমন বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু এ ব্যাপারে যথার্থ বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের দয়াতেই তিনি দারুণ দুর্দিন থেকে কাটিয়ে ওঠেন এবং লনডনে ফিরে গিয়ে ব্যারিস্টারি শেষ করার সুযোগ পান।

১৮৬৭ সালের ১৯ জানুআরি তিনি ফ্রান্স থেকে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করেন। কিন্তু হেনরিএটা এবং দুই সন্তানকে তিনি ভের্সাইতেই রেখে যান। এ সময়ে হেনরিএটা গর্ভবতী ছিলেন।[১০৫] পরিবার ফ্রান্সে রেখে যাওয়ার কারণ: তিনি আশা করেছিলেন যে, সন্তানরা তা হলে পুরোপুরি য়োরোপীয় হয়ে উঠবে।[১০৬] শর্মিষ্ঠা দ্রুত ফরাসি ভাষা শেখায়, তিনি গর্ব করে বলেছেন যে, তার জন্ম হুগলির কাদামাটিতে তা মনেই হয় না।[১০৭] শর্মিষ্ঠা যখন ফ্রান্সে যান তখন তাঁর বয়স ৪, ফ্রেডারিকের ২। তাঁরা ফ্রান্সে ছিলেন ৬ বছর। সুতরাং পুরোপুরি য়োরোপীয় না হলেও, এই দুই সন্তান রীতিমতো ফরাসি ভাষাভাষী হয়ে উঠে-ছিলেন। সে জন্যেই কলকাতায় ফিরে তাঁরা মায়ের সঙ্গে ফরাসি

ভাষাতেই কথাবার্তা বলতেন। তাঁদের ফরাসি কথাবার্তা শুনেই উত্তরপাড়ার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মনে করেছিলেন যে, হেনরিএটা আসলে ফরাসি।[১০৮] কিন্তু রাসবিহারী এ যুগের প্রবাসী বাঙালি শিশুদের দেখলে অমন অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন না সম্ভবত।

হেনরিএটা অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ কেন কলকাতায় ফিরে এলেন, বলা শক্ত। একটা কারণ, মধুসূদন নিয়মিত টাকাকড়ি পাঠাচ্ছিলেন না। জাহাজ কম্পানিকে লেখা হেনরিএটার পত্র থেকেই তাঁর অনটনের প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ এ সময়েই মধুসূদনের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো ছিলো। কিন্তু কলকাতায় ফিরে হেনরিএটা বেশিদিন অর্থস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারেননি। অতঃপর ব্যারিস্টারি ছেড়ে দিয়ে মাইকেল বার বার চাকুরি পরিবর্তন করতে থাকেন। তার চেয়েও বড়ো কথা, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবং এর পরেই শুরু হয় দারুণ অর্থকষ্ট। তবে কলকাতায় ধার দেওয়ার অনেক লোক ছিলেন, দয়া করারও। জীবনের শেষ দু বছর স্বামী-স্ত্রী দুজনই খুব অসুস্থ এবং আর্থিক সংকটে ছিলেন। তাঁদের কী রোগ হয়েছিলো জীবনীলেখকরা সে সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রাখেননি। তাঁদের এই অসুস্থতা পরবর্তীকালে নজরুল ইসলাম এবং প্রমীলার অসুস্থতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মাইকেল পানাসক্ত ছিলেন। হেনরিএটাও তাঁর প্রভাবে পানাসক্ত হয়েছিলেন। ফ্রান্সে তাঁর হোটেলের বিল থেকে দেখা যায় তিনি রোজ দু বোতল মদ কিনতেন।[১০৯] হয়তো পানাসক্তি থেকেই তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

হেনরিএটা মাইকেলের সঙ্গে মোটামুটি ১৫ বছর সংসার করেছিলেন। তার মধ্যে বছর তিনেক তাঁরা দূরে ছিলেন। আর শোচনীয় অর্থসংকটের মধ্যে কাটান ফ্রান্সে চার বছর এবং কলকাতায় শেষ দু বছর, এই মোট ছ বছর। হয়তো কমবেশি ছ বছর তাঁরা মোটামুটি সুখে কাটিয়েছিলেন। কিন্তু হেনরিএটা সহিষ্ণুতার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল, বাস্তবতাবর্জিত এবং বেহিশেবি মাইকেলকে অনুসরণ করেছিলেন ছায়ার মতো।

সন্তানদের নিয়েও হেনরিএটা সুখী হননি। ফ্রান্সে একটি কন্যা জন্মেই মারা যায়। ম্যালেরিয়ায় তাঁর সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল ফ্রেডারিকের মৃত্যু ১৪ বছর বয়সে। তবে হেনরিএটার সৌভাগ্য যে,

এ ঘটনা ঘটে তিনি নিজে মারা যাবার দু বছর পরে ১৮৭৫ সালের ১১ জুন তারিখে।[১১০] কন্যা হেনরিএটা শর্মিষ্ঠার ভাগ্য ছিলো মায়ের চেয়েও খারাপ। তাঁর জীবনের বেশির ভাগই কাটে দারিদ্র্যে এবং স্বজন হারানোর দুঃখে। পিতামাতার মৃত্যু ছাড়াও, তিনি এক ভ্রাতা এবং এক ভগ্নীর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অমলেন্দু বসু মাইকেলের সমালোচনা করে লিখেছেন যে, তিনি নিজে বালিকা বিবাহ করতে চাননি, কিন্তু কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন মাত্র ১৪ বছর বয়সে।[১১১] আসলে বিয়ের সময়ে হেনরিএটা শর্মিষ্ঠার বয়স ছিলো আরো কম,—১৩ বছর ৭ মাস ২৩ দিন।[১১২] কিন্তু কবি এক্ষেত্রে বেকসুর খালাশ পেতে পারেন। কারণ এ বিয়ে হয় তাঁর মৃত্যুর মাত্র ১ মাস ২৩ দিন আগে। আর হেনরিএটার মৃত্যুর ১ মাস ২০ দিন আগে। বোঝা যায়, হেনরিএটা তাঁর আসন্ন মৃত্যুর এবং কন্যার উদ্ভিন্ন যৌবনের কথা চিন্তা করেই প্রাণপণ চেষ্টা করে এই বিয়ে দিয়েছিলেন। শর্মিষ্ঠার ভাগ্যে এই বিয়ে অবশ্য বেশিদিন টেকেনি। তাঁর স্বামী উইলিয়াম ওয়াল্টার এভান্স ফ্লয়েড দু বছর ৪ মাস পরেই মারা যান।[১১৩] শর্মিষ্ঠার দ্বিতীয় বার বিয়ে হয় ১৮৭৭ সালের ১৩ জানুআরি। একটি সন্তান জন্ম দেবার পর তিনি নিজেই মারা যান ১৮৭৯ সালের ১৩ ফেব্রুআরি।[১১৪]

এরপর বাকী থাকেন কনিষ্ঠপুত্র অ্যালবার্ট নেপোলিয়ন দত্ত। মৃত্যুর আগে কবি দুই পুত্রের ভার দিয়েছিলেন স্নেহভাজন দুই ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ আর উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির হাতে। তাঁরা হয়তো কবি-পুত্রদের যত্ন নিয়েছেন। তবে অ্যালবার্ট পিতার ধ্রুপদী ভাষা আর সাহিত্য-চর্চার উত্তরাধিকার লাভ করেননি। সাধারণ শিক্ষিত হিশেবে সরকারী আবগারি বিভাগের কনিষ্ঠ কর্মকর্তা হয়েছিলেন। তিনি মারা যান ১৯০৯ সালের ২০ আগস্ট তারিখে।[১১৫] আর তারই সঙ্গে শেষ হয় মাইকেলের মাদ্রাসজীবনের শেষ স্মৃতি।

আপাতদৃষ্টিতে মাদ্রাসের সঙ্গে মাইকেলের যোগাযোগকে তেমন সৌভাগ্যের কারণ বলে মনে হয় না। তাঁর জীবনের এক দুঃসময়ে বিশপস কলেজের লেখাপড়া ছেড়ে তিনি মাদ্রাস যাত্রা করেছিলেন। পিতামাতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কার্যত তখনই শেষ হয়। তারপর আট বছর পরে তিনি যখন মাদ্রাস ত্যাগ করেন, তখনো স্ত্রী এবং সন্তানদের

সঙ্গে চিরকালের মতো সম্পর্ক ছিন্ন হয়। মাদ্রাস থেকে কলকাতায় এসে হেনরিএটা তাঁর জীবনে সৌভাগ্যের সূচনা করেছিলেন কিনা, তথ্যের অপ্রতুলতাবশত এখন সে কথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু মাদ্রাসে তিনি রীতিমতো ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্যের স্বাদ পেয়েছিলেন। মাদ্রাসের ঐ শিক্ষা ছাড়া তিনি মেঘনাদবধ কাব্য লিখতে পারতেন কিনা, সন্দেহ আছে। তদুপরি, একাধিক পত্রিকা সম্পাদনা এবং একটি কাব্য ও একটি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশনার মাধ্যমে তিনি যে-আত্মবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তা ভবিষ্যতে তাঁকে উৎসাহ জুগিয়ে ছিলো। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পরবর্তীতে অলীক-কুনাট্য-রঙ্গকে ধিক্কার দিয়ে নাটক এবং বাজী ধরে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করতে পেরেছিলেন। তাঁর মধ্যে যে-নির্ভীক স্বাধীনচেতা মনোভাব লক্ষ্য করি তার অনেকটাই তিনি অর্জন করেছিলেন মাদ্রাসে ইংরেজদের সঙ্গে সমানাধিকারের ভিত্তিতে মেলামেশা করে। নিজেই তিনি লিখে-ছিলেন, সে সুযোগ কলকাতায় ছিলো না।[১১৬]

তথ্যনির্দেশ

১ গৌরদাস বসাককে লেখা মাইকেলের চিঠি, ১৮ আগস্ট ১৯৪৯। পত্র সংখ্যা ৪২, কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রবালী, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত (কলকাতা: গ্রন্থনিলয়, ১৯৬৩), পৃ. ১১৩। অতঃপর পত্রাবলী নামে উল্লেখিত।

২ ফ্রান্সে বাসকালে (১৮৬৪-৬৬) একবারই এর ব্যত্যয় লক্ষ্য করি। তখন তিনি ভের্সাইতে অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যে সপরিবারে বাস করছিলেন। এসময়ে অনাহার ছাড়াও দেনার দায়ে তাঁর কারাবাসের আশঙ্কা দেখা দেয়। চার্চ এবং বিভিন্ন ব্যক্তির বিশেষ করে এক মহিলার দয়ার ওপর নির্ভর করেই তিনি বেঁচে ছিলেন। তাঁর এই দুরবস্থা কী শোচনীয় এবং মর্মান্তিক তা বোঝানোর জন্যে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অনেকগুলো চিঠিতে পরিবারের সদস্যদের এবং তাঁদের দুর্গতির খবর দিয়েছেন।

৩ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য (কল-কাতা: পুথিপত্র, ১৯৭৫), পৃ. ৯০।

৪ যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (দেজ সং; কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৩), পৃ. ১০১; নগেন্দ্রনাথ বসু,

মধুস্মৃতি (দ্বিতীয় সং, কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৫৪) পৃ. ৪৮।

৫ নগেন্দ্র নাথ সোম, পৃ. ৪৮।

৬ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পৃ. ৯০।

৬ক *Athenaeum* 20 Jan., 1848, Shipping Intelligence.

৭ মধুসূদন চিঠিতে লিখেছিলেন, মাদ্রাস যাবার কথা দুতিন জনকে জানিয়ে ছিলেন। সুতরাং জীবনীকারেরা ধরে নিয়েছিলেন যে, এঁরা নিশ্চয়ই বিশপস কলেজের ছাত্র।

৮ *Athenaeum*, 2 Jan., 1848.

৯ পত্রসংখ্যা ৩৬, পত্রাবলী, পৃ. ১০২

১০ সাধারণভাবে দীক্ষা দিতেন সাধারণ চ্যাপলেইনরা। কিন্তু মধুসূদন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেই আর্চডিকন নিজে দীক্ষা দেন। N/1, Vol. 64 (10R). p. 101.

১১ *Athenaeum*, 17 April, 1848.

১২ W. H. B. Morens, "Michael Madhusudan Dutt & his Anglo-Indian Wives", *Bengal Past and Present*, Vol. 26, No. 2, (Oct-Dec., 1923), p. 191.

১৩ জনৈক জীবনী লেখক বলেছেন যে, মাইকেল সুখী হবেন মনে করে রেবেকার অভিভাবক এবং ধর্মপিতা জর্জ নর্টন এই বিয়েতে সম্মতি দান করেন। —ঋষি দাস, মাইকেল মধুসূদন (কলকাতা: অশোক প্রকাশন, ১৯৭৩), পৃ. ৭২। মাইকেল সুখী হবেন, তাতে রেবেকার ধর্মপিতা কেন বিয়ে দেবেন, এ যুক্তি বোঝা শক্ত।

১৪ জর্জ নর্টনের সহায়তার কথা প্রথমে লেখেন নগেন্দ্রনাথ সোম (পৃ. ৫০)। কিন্তু সুরেশচন্দ্র মৈত্র ঠিকই ধরেছেন যে, নর্টনের সঙ্গে তখনো মাইকেলের পরিচয়ই হয়নি (পৃ. ১০২)। মাইকেলের ১৯ মার্চ ১৮৪৯ তারিখের চিঠি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তখনো তিনি জর্জ নর্টনের সঙ্গে পরিচিত হননি ভালো করে।

১৫ পত্রসংখ্যা ৩৬, পত্রাবলী, পৃ. ১০২

১৬ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাইকেল জীবনীর আদি পর্ব (কলকতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৯৬২), পৃ. ১০৮।

১৭ মাইকেল মধুসূদন: জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ৯৫

১৮ সুরেশচন্দ্র মৈত্র (সম্পাদক), মধুসূদন রচনাবলী (কলকতা: মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৪), পৃ. ঞ। বিয়ের সময়ে ডুগালড ম্যাকট্যাভিশ চার্চে হাজির ছিলেন বলে সুরেশচন্দ্র মৈত্র যে-দাবী করেছেন, তার কোনো প্রমাণ নেই।

১৯ N/2, Vol. 27(India Office Records, London) p. 436.

২০ N/2, Vol. 13 (10 R), p. 196.

২১ N/2, Vol. 10 (10 R), p. 268.

২২ N/2, Vol. 16 (10 R), p. 159.

২৩ N/2, Vol. 22 (10 R), p. 87.

২৪ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পৃ. ৯৮-৯৯। অবশ্য মধুসূদন রচনাবলীতে সুরেশচন্দ্র মৈত্র বিয়ের সত্যিকার তারিখ উদ্ধার করেছেন। তবে সাক্ষীদের বিষয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা থেকে মনে হয়, তিনি নিজে চার্চ রেজিস্টার দেখেননি। ব্যানস আর লাইসেন্স সম্পর্কে তিনি যা অনুমান করেছিলেন (মাইকেল মধুসূদন, পৃ. ১০০), তা অবশ্য সঠিক। কিন্তু ব্যানসের যে-সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন, তা ঠিক নয়। ব্যানস হলো বিয়ে করার জন্যে চার্চের মাধ্যমে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি। এতে প্রস্তাবিত পাত্রপাত্রীর নামোল্লেখ করে প্রকাশ্য জানানো হয় যে, এঁদের বিয়ে কেন হতে পারে না, এমন কোনো কারণ কারো জানা থাকলে বিয়ের নির্ধারিত তারিখের আগেই যেন জানিয়ে দেয়।

২৫ N/2, Vol. 27 (10 R), p. 436

২৬ ঐ

২৭ লেখাপড়ার এই রুটিন তিনি দীর্ঘদিন অনুসরণ করতে পারেননি। অচিরেই তিনি *Eurasian* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

২৮ পত্রসংখ্যা ৩৭, পত্রাবলী, পৃ. ১০৪।

২৯ পত্রসংখ্যা ৩৮, পত্রাবলী, পৃ. ১০৭।

৩০ 'Correspondence,' *Athenaeum*, 17 April 1849.

৩১ পত্রসংখ্যা ৪১, ৬-৭-৪৯, পত্রাবলী, পৃ. ১১২।

৩২ N/2, Vol. 28 (10 R), p. 557.

৩৩ এই উপলক্ষে মাইকেল একটি সনেট লিখেছিলেন। কবিতাটির নাম On the Departure of my Wife and Child for the Upper Provinces.'

৩৩ N/2, Vol. 30 (10R), p. 330.

৩৫ ঐ।

৩৬ N/2, Vol. 31 (10R), p. 260. জন্ম তারিখ ২৬ জুলাই।

৩৭ N/2, Vol. 36 (10R), p. 167.

৩৮ N/2, Vol. 6 (10R), p. 425. চার্চ রেজিস্টারে সফিয়া ম্যাকেনজির কোনো পরিচয় দেওয়া হয়নি। তবে তিনি বিধবা ছিলেন। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় ১৮১২ সালে।

৩৯ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পৃ. ১০৬

৪০ এ পত্রিকা প্রকাশিত হতো সপ্তাহে তিনবার, বিজ্ঞাপন ছাড়াও এতে অন্যান্য রচনা স্থান পেতো।

৪১ *Athenaeum*, 5 Oct., 1850, মাইকেলের জীবনী লেখকরা এই পত্রিকার প্রকাশকাল নিয়ে নানা বিভ্রান্তিকর খবর দিয়েছেন।

৪২ ঐ

৪৩ *Athenaeum*, 9 March 1852, editorial.

৪৪ ঐ

৪৫ *Athenaeum* এই মন্তব্য করে ১৮৫১ সালের প্রথম ভাগে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে।

৪৬ *Athenaeum*, 9 March 1852.

৪৭ গবর্ণরকে লেখা পরিচালকমণ্ডলীর পত্র, ২৬ মার্চ ১৮৫২, The Eleventh Annual Report from the Governors of the Madras University (Madras : Pharoah & Co., 1852), p. 13.

৪৮ ঐ, পৃ. ১৪

৪৯ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পৃ. ১১৯

৫০ ঐ, পৃ. ১৩০-৩২

৫১ *Spectator* দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয় ১৮৫৫ সালের ৬ মার্চ তারিখে

৫২ *Athenaeum*, 18 Dec. 1855.

৫৩ তাঁর ভাষায়, '···if you encourage me to hope that my father has left sufficient property to warrant my launching out a little cash for the recovery there of···' পত্র সংখ্যা ৪৪, পত্রাবলী, পৃ. ১৪৪।

৫৪ পত্রসংখ্যা ৪৫, পত্রাবলী, পৃ. ১২০

৫৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত (তৃতীয় সং; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৫), পৃ. ৩০; ঋষিদাস, পৃ. ৯৬

৫৬ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃ. ১৪৫

৫৭ একথা ঠিক নয়। তখনকার যাত্রীদের তালিকা থেকে বহু দেশীয় লোকের নাম পাওয়া যায়। তবে ক্যাবিন যাত্রীদের নামই প্রকাশিত হতো এবং ক্যাবিনে ভাড়াও ছিলো প্রায় তিনগুণ।

৫৮ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পৃ. ১৪৯-৫০

৫৯ A. Bose, *Michael Madhusudan Dutt* (New Delhi : Sahitya Akademi, 1981), Pp. 90-91.

৬০ *Athenaeum*, 29 January 1856, p. 50.

৬১ হতে পারে জাহাজটি কলকাতায় পৌঁছে রাতের বেলায়, এবং তার জন্যেই পরের দিন সকালে তীরে উঠে মাইকেল লিখেছেন 'আজ সকালে'।

৬২ *New Calcutta Directory for* 1857 (Calcutta : P. M. Cranenburgh, 1857), pt. XI.

৬৩ পুরো বাক্যটি থেকে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'Yes, dearest Gour, I have a fine English wife and four children.'

৬৩ক N/2, Vol. 36 (10R), p. 167.

৬৪ N/2, Vol. 36 (10R), p. 217.

৬৪ক N/2, Vol. 74 (10R), p. 65.

৬৫ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, মাইকেল মধুসুদন দত্ত, পৃ. ১৪৩

৬৬ পত্রসংখ্যা ৫৭ (রাজনারায়ণ বসুকে লেখা), পত্রাবলী, পৃ. ১৩৩

৬৭ A. Bose, p. 36. এই তথ্য অমলেন্দু বসু কোথায় পান, জানিনে। নগেন্দ্রনাথ সোম কবির সাগরদাঁড়ি সফরের কথা বললেও, হেনরিএটা সঙ্গে ছিলেন এমন কোনো আভাস দেননি।

৬৮ N/2, Vol. 21 (10R), p. 424

৬৯ N/2, Vol. 27 (10R), p. 345.

৭০ *Madras University Report*-এ A. Dique-এর কনিষ্ঠভ্রাতা L. Dique-এর পরিচয় দেওয়া আছে East Indian, Roman Catholic.

৭১ W. H. B. Morens, 'Michael Madhusudan Dutt and his Anglo-Indian Wives', *Bengal Past and Present*, Vol. 26, pt. II (Oct.-Dec., 1923), p.191

৭২ পত্রসংখ্যা ১২২, পত্রাবলী, পৃ. ২৪৮

৭৩ N/I, Vol. 97 (10R), p. 231.

৭৪ বাবার নাম লেখা হয়েছিলো Michael Madhusudana Dutt, পেশা : Interpreter, Police Office.

৭৫ N/I, Vol. 101 (10R), p. 38.

৭৬ N/2, Vol. 15 (10R), p. 267.

৭৭ N/2, Vol. 16 (10R), p, 48. নাম বদলের একটা ইতিহাস এই পরিবারে লক্ষ্য করি। অ্যামিলিয়ার ছোটো বোনের ব্যাপটিজমের সময় নাম লেখা হয় হেস্টার, পিতার উইলেও তাই, কিন্তু বিয়ের সময়ে চার্চের রেজিস্টারে তাঁর নাম দেখতে পাচ্ছি হেলেন। N/2, Vol. 38 (10LR), p. 353.

৭৮ N/2, Vol. 22, p. 100.

৭৯ অ্যামিলিয়া তাঁর পিতার মোট সম্পত্তির ২/৯ ভাগ পেয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য জেমস কৃপলির উইল, L/A6/34/29, Vol. 288 (10R), p. 18.

৮০ N/2, Vol. 16 (10R), p. 419.

৮১ N/2, Vol. 38 (10R), p. 353.

৮২ N/2, Vol. 39 (10R), p. 73.

৮৩ পত্রসংখ্যা ৫৭ (রাজনারায়ণ বসুকে লেখা), পত্রাবলী, পৃ. ১৩২-৩৩। কয়েক বছর পরে অ্যামিলিয়ার মা যখন মারা যান, তিনি তখন অ্যামিলিয়াকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেননি। তা থেকেও এই যোগাযোগ প্রমাণিত হয়। দ্রষ্টব্য সফিয়া কৃপলির উইল, L/A6/34/29/263, Pp. 17-19

৮৪ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কৃপলি একটি বিরল ইংরেজি নাম। সুতরাং একই খৃস্টান নামের বহু কৃপলি থাকা অস্বাভাবিক, অসম্ভব না হলেও।

৮৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হেনরিএটাকে মধুসূদনের সঙ্গে একই জাহাজে কলকাতায় এনেছন (মধুসূদন দত্ত, পৃ. ৩০)। অন্য লেখকরা বলেছেন, তিনি পরে কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

৮৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধুসূদন দত্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৯।

৮৭ ঐ, পৃ. ২৯।

৮৮ পত্রাবলী, পৃ. ২৫৮।

৮৯ বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: নগেন্দ্রনাথ সোম, পৃ. ৩১৮-২৪

৯০ ক্ষেত্র গুপ্তও অনুরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দ্রষ্টব্য; মধুসূদন দত্ত: জীবন কথা, মধুসূদন রচনাবলী (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৫), পৃ. তেইশ।

৯১ A. Bose, p. 90.

৯২ *Athenaeum*, 24 May 1856, Shipping Intelligence.

৯৩ যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লেখা রাজনারায়ণ বসুর চিঠি, যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৭১। সুরেশচন্দ্র মৈত্র লিখেছেন, মাইকেলের বন্ধু নেইলর কলকাতায় আসতেন (পৃ. ১০২)। এতথ্য তিনি কোথায় পান, জানিনে।

৯৪ N/11, Vol. 6 (10R), p. 1005.

৯৫ ঐ, পৃ. ১০০৭ ।

৯৬ N/11, Vol. 8 (10R), p. 814.

৯৭ A. Bose, p. 35

৯৮ N/2, Vol. 88 (10R), p. 96.

৯৯ N/2, Vol. 115 (10R) p. 220.

১০০ পত্রসংখ্যা ৯৩, পত্রাবলী, পৃ. ২০৪

১০১ পত্রসংখ্যা ১১৩, পত্রাবলী, পৃ. ২৩৬

১০২ পত্রসংখ্যা ৯৮, পত্রাবলী, পৃ. ২১২

১০৩ ঐ।

১০৪ এই প্রসঙ্গে বাণী রায় লিখেছেন, 'আঁরিয়েতের ক্ষীণস্বাস্থ্য তো তাঁহার ন্যূনাধিক চার বার সূতিকাগারে যাওয়া রোধ করিতে পারে নাই। দারুণ অর্থাভাবের মধ্যে বিদেশেও তিনি সন্তানের জন্ম দিয়াছেন। অথচ মধু আধুনিক পাশ্চাত্যপন্থী। আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার সংস্থানের পটভূমিকায় বিচারে তিনি অপরাধী। তাঁহার ভালোবাসায় সম্ভ্রমবোধ কম।'—মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা (কলকাতা : গ্রন্থম, ১৯৬১), পৃ. ১১৪। আসলে বাণী রায় জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার ইতিহাস জানেন না। জানলে এমন মন্তব্য করতে সংকোচ বোধ করতেন। বস্তুত, তাঁর তথ্যবিরল গ্রন্থে নতুন ব্যাখ্যা না-থাকলেও, উদ্ভট ব্যাখ্যা অনেক আছে। রেবেকার সঙ্গে মাইকেলের বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে তিনি যে অনুমান করেছেন, সে-ও এ ধরনের উদ্ভট ব্যাখ্যার অন্যতম। এ রকম আর-একটি বই বিধান দত্তের অপ্রকাশিত শ্রীমধুসূদন (কলকাতা : শ্যাম-শোভা, ১৯৮৩)।

১০৫ ফ্রান্স ত্যাগের আগে হেনরিএটা জাহাজ কম্পানিকে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকে মনে হতে পারে তাঁর সঙ্গে একটি মাত্র পুত্র ছিলো। আসলে তিনি ভাড়া কমানোর জন্যে তদবির করছিলেন, সে জন্যে বছর দেড়েক বয়সের ছেলেটির উল্লেখ করেননি। (হেনরিএটার পত্রের জন্যে দ্রষ্টব্য : নগেন্দ্রনাথ সোম, পৃ. ৩৬০)। কিন্তু স্ত্রী এবং সন্তান কলকাতায় ফেরার পর মাইকেল ঠিকই লেখেন, "...my poor Sermista (who returned to India with mother and brothers...)' পত্রাবলী, পৃ. ২৬৮

১০৬ পত্রসংখ্যা ৯৯, পত্রাবলী, পৃ. ২১৫

১০৭ পত্রসংখ্যা ১০২, পত্রাবলী, পৃ. ২১৯

১০৮ যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ৪৩৭

১০৯ নগেন্দ্রনাথ সোম, পৃ. ৩৬০

১১০ N/1, Vol. 152 (10R), p.529.

১১১ A. Bose, p. 90.

১১২ N/1, Vol. 144 (10R), p. 69.

১১৩ তিনি মারা যান ১৮৭৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে। N/1, Vol. 153 (10LR), p. 248.

১১৪ N/1, Vol. 167 (10R), p. 209.

১১৫ N/1, Vol. 359 (10R), p. 220. তাঁর পদবী লেখা আছে, Dutt নয়, Dutton-ও নয়, Datta।

১১৬ পত্রসংখ্যা ৪১, পত্রাবলী, পৃ. ১১০